উত্তরে বাংলার মুক্ত কণ্ঠ

এখন ডুয়ার্স

জুলাই ২০১৯। ২০ টাকা

জল। জঙ্গল। জনসত্ত্বা

৫ বছর পেরিয়ে

বঙ্গ বিজেপি এখনও গ্যাস বেলুন, তবু...

কড়া কীটনাশকেও মরছে না চা বলয়ের মশা!

নতুন। থ্রিলার মরা মৌমাছির চোখ।

উপন্যাস তাজ্জব মহাভারত।

উত্তরের উপকথা

সেদিনের সেনাপতিরা। কবির কলমে গদ্য।

গল্প। নীলবাঘ পর্যটন। বাশবটে এক্কাবাড়ি

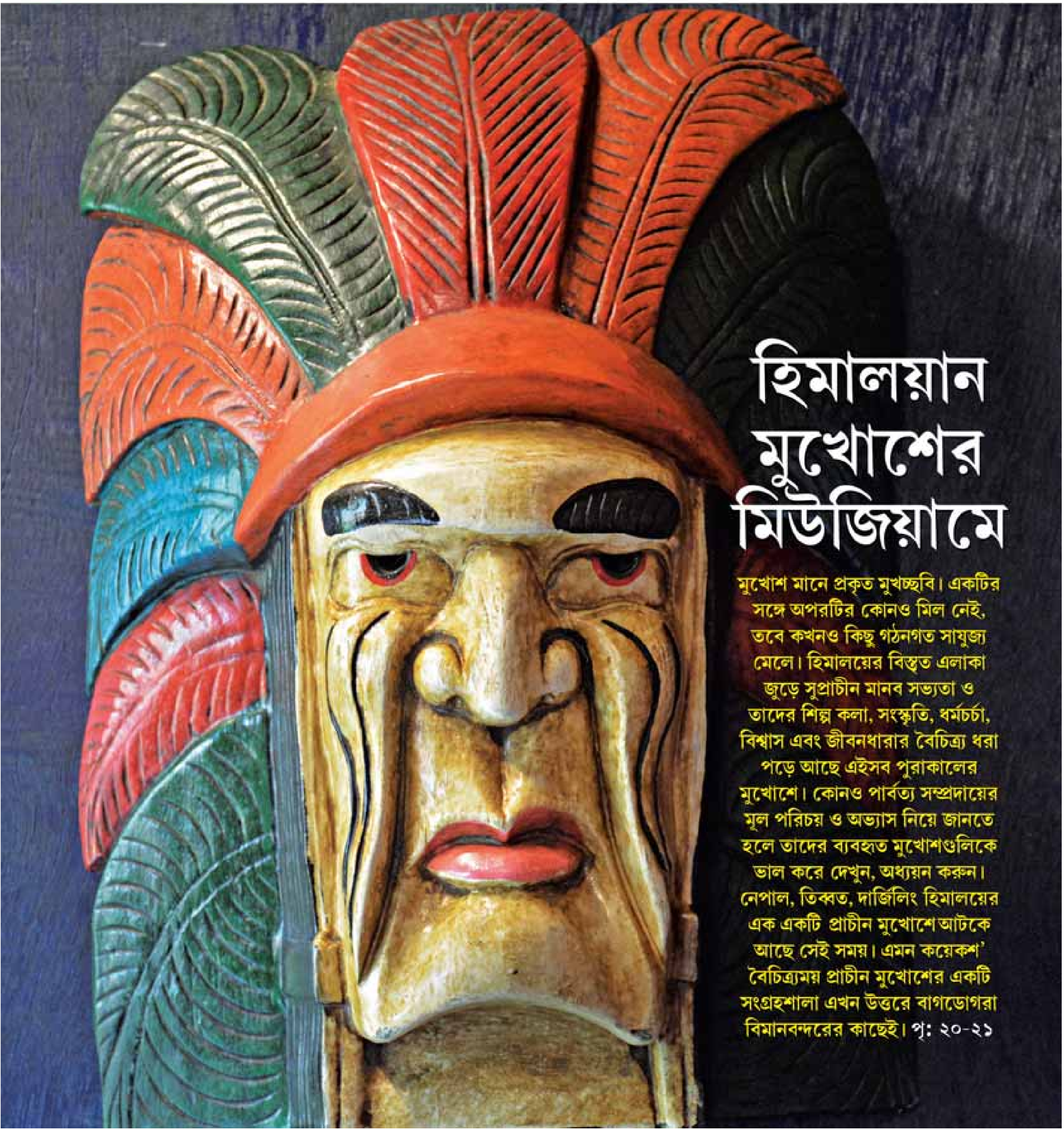

হিমালয়ান মুখোশের মিউজিয়ামে

মুখোশ মানে প্রকৃত মুখচ্ছবি। একটির সঙ্গে অপরটির কোনও মিল নেই, তবে কখনও কিছু গঠনগত সাযুজ্য মেলে। হিমালয়ের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে সুপ্রাচীন মানব সভ্যতা ও তাদের শিল্প কলা, সংস্কৃতি, ধর্মচর্চা, বিশ্বাস এবং জীবনধারার বৈচিত্র্য ধরা পড়ে আছে এইসব পুরাকালের মুখোশে। কোনও পার্বত্য সম্প্রদায়ের মূল পরিচয় ও অভ্যাস নিয়ে জানতে হলে তাদের ব্যবহৃত মুখোশগুলিকে ভাল করে দেখুন, অধ্যয়ন করুন। নেপাল, তিব্বত, দার্জিলিং হিমালয়ের এক একটি প্রাচীন মুখোশে আটকে আছে সেই সময়। এমন কয়েকশ' বৈচিত্র্যময় প্রাচীন মুখোশের একটি সংগ্রহশালা এখন উত্তরে বাগডোগরা বিমানবন্দরের কাছেই। পৃ: ২০-২১

এখন ডুয়ার্স **সম্পাদকের চিঠি**

তবু ধর্মই হোক বর্ম

মনুষ্যত্বের ট্র্যাক থেকে চ্যুত না হয়ে জীবন যাপনের উদ্দেশ্যেই একদিন ধর্ম সৃষ্টি করেছিল মানব দলপতিরা। ততদিনে অভিযোজিত মানুষ শিখে গেছে, দলবদ্ধভাবে বেঁচে থাকতে গেলে নিজেদের মধ্যে নীতিবোধ নিয়ে চলতে হবে, ভাল ও মন্দকে পৃথক করা শিখতে হবে। যাকে বলা যায় মানুষের প্রথম ধর্মচেতনা। শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনে এ ওর জিনিস নিয়ে বা নারীকে নিয়ে টানাটানি কাটাকাটি নেই, মানুষ সেই নিরাপদ সুখের স্বাদ পেতে শুরু করতেই বড় বড় দল গড়ে থাকতে লাগল, তৈরি হল সমাজ, সূচনা হল সম্পর্কের। প্রকৃতি-পূজারি মানুষকে ঈশ্বরের মানবরূপ বিশ্বাস করানোটাই ছিল গোষ্ঠীপতিদের প্রথম উদ্দেশ্য। মানবরূপী ঈশ্বরের দূতের মুখে নানা বাণী ও ধর্মোপদেশ, পূজা-আর্চার মাধ্যমে মানুষকে ধর্মভীরু ন্যায়নীতি বোধসম্পন্ন করে তোলাই ছিল তাদের কাজ।

সে হিসেবে দেখতে গেলে ধর্ম একদিন মানুষকে একত্রিত হতে শিখিয়েছিল, ক্ষুধা-যৌনতার বাইরে ভালবাসা ত্যাগ তিতিক্ষার প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। কিন্তু মুস্কিলটা দেখা দিল এর পরেই। সমাজ যত বড় হতে লাগল, স্বার্থের সঙ্ঘাত বৃদ্ধিতে, ধর্মীয় মতবাদগুলি সাংস্কৃতিক সাযুজ্য খুঁজে খুঁজে আলাদা আলাদা হয়ে যেতে লাগল। মানুষের ধর্মচর্চা, ঈশ্বরে বিশ্বাস বজায় থাকল ঠিকই, কিন্তু এলাকা দখলের মোহে, দেশ দখলের আতিশয্যে মানুষে মানুষে হিংসা ও বিভাজন বাড়তেই থাকল। ধর্মের ভিত্তিতে শস্যশ্যামলা জমি দখলের যুগ শুরু হল, ধর্মের ছুতোয় অধর্মের রাজত্ব চালু হল পৃথিবী জুড়ে। যার শেষ কোথায় আজ পর্যন্ত কেউ জানে না। অনেকেই তাই বলেন, ধর্ম আসলে অপদেবতাদের সৃষ্ট মায়াজাল কৌশল।

অন্যদিকে দেখতে গেলে দেবতার পূজা ও দেবতায় বিশ্বাস ছাড়া ধর্ম কিন্তু মনুষ্যত্বের উন্নতিকল্পে তেমন কিছু শেখাতে পারে নি। যুগে যুগে মানবরূপী দূতরা এসেও শেখাতে পারেন নি সৎ থাকার ও ক্রোধ-হিংসা বর্জনের ধর্মকে। সেসব উপদেশ ধর্মগ্রন্থের পাতায় বার বার উচ্চারিত হলেও, গ্রন্থালয় বা দেবালয়ের বাইরে তা বেরোতে পারে নি কখনও। গোষ্ঠীপতি বা নৃপতিরা শাসন কায়েম রাখতে ধর্মকে সুড়সুড়ি হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে, কখনও সেবার অছিলায়, কখনও বা নামগানের মোহে, কখনও জাতিভক্তির মুখোশে। অথচ মানুষ দিনের পর দিন অসৎ থেকে আরও অসৎ হয়েছে, হিংস্রতা ও পরশ্রীকাতরতার শেষপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে সবার অলক্ষ্যে। ধর্মের নামে মানুষ খুন তাই সেযুগেও ছিল স্বাভাবিক ঘটনা, এ যুগেও তা নৈমিত্তিক খবর।

কিন্তু অতি সত্যি কথাটি হল, ধর্ম থেকে মানুষকে আর আলাদা করা সম্ভব নয়। কাজেই ধর্ম নিয়ে উন্নাসিকতা কোনও সমাধান আনতে পারে না। রাজনীতিকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে একদিন ঈশ্বরবিরোধী প্রচারে গিয়ে ফল মিলেছে উলটো, মানুষ আরও বেশি করে ধর্মকে আঁকড়ে ধরেছে, পুঁথিগত শিক্ষা কোনও হেলদোল জাগাতে পারে নি তাদের মনে। আজ তাই ধর্মজনিত কঠিন সামাজিক রোগ প্রতিরোধে বা নিরাময়ে আশু প্রয়োজন বোধহয় ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে পরধর্ম সহিষ্ণুতার সর্বাত্মক প্রচার— ধর্ম আফিং হলেও ওষুধও হতে পারে। প্রাথমিক সততা ছাড়া, শিক্ষা ছাড়া, যোগাভ্যাস ছাড়া ধর্ম হয় না, ইত্যাদি এই সুযোগে মানুষকে শেখাতে পারেন ধর্মীয় নেতারা। ধর্মভিত্তিক বিভাজনের প্রাবল্যে আজ যেমন চোখে পড়ে আশ্চর্য মিলেমিশে একাকার জাতপাত বৈষম্য, মুখ থুবড়ে পড়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের ধ্বজা, তেমনই ধর্মই আজ বর্ম হতে পারে ধর্মোন্মাদদের বিরুদ্ধে লড়াইতে। তুমি সব ধর্মের দেবতা বা পুরোহিতদের থেকে সমান নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতেই পার, কিন্তু ধর্মের নামে হানাহানি হলে লোকে নাস্তিক বলে পাত্তাই দেবে না তোমার হিতোপদেশকে। বরং ধর্মীয় দুষ্কৃতিদের চিহ্নিত করে নিশ্চিহ্ন কর, পীড়ন কিংবা তোষণের পথ ছেড়ে দাও, সব ধর্মের বিশ্বাস অর্জন করাই হোক ধর্মভিত্তিক রাজনীতির দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে প্রথম চ্যালেঞ্জ।

ঈশ্বরের দূতেরা এসে পৃথিবীকে বলে গেছেন, অন্যকে সৎ পথে থাকার পথ দেখানোই হোক সাধনা, প্রকৃত ধর্মের প্রথম পথ। মিথ্যা দিয়ে এক-দুবার হলেও বারবার যুদ্ধে জেতা যায় না!

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

এখন ডুয়ার্স পত্রিকা প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড ৯৪৩৪৩২৭৩৪২

শিবমন্দির
অনুপ দাস, শিবমন্দির বাজার ৯৮৩২০২৯৫১৪

জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক, কমার্স কলেজের বিপরীতে ৯৭৩৩২৪৬৯১৩

মালবাজার
সম্রাট (হোম ডেলিভারি) ৯৩৩২০০৫৮৬৫

চালসা
দিলীপ সরকার, চালসা মোড় ৯৭৭৫৪১৫১৪৪

বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল ৯৪৩৪৮০৯৫৯০

বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২

মাদারিহাট
জগৎ চৌধুরী (হোম ডেলিভারি) ৯৭৪৯৭২৫৭৮১

লাটাগুড়ি
সৌমেন (হোম ডেলিভারি) ৯০০২৪০৯৮৯৩

ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮

ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯

তুফানগঞ্জ
আনন্দবাজার বুক স্টল ৯৩৩৩৬৮৮৬৭১

দিনহাটা
হরিপদ রায় ৯৯৩২৬৩৯০৬৮

আলিপুরদুয়ার
দীপক কুমার হোড়, কলেজ হল্ট ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭

কোচবিহার
জয়ন্ত দাস, বড় পোস্ট অফিসের বিপরীতে ৯৪৩৪২১৭০৮৪

মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি ৭৮৬৪৯৯৫৫১৫

বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩
ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার ৪০৬৪৪০৯৭

এখন ডুয়ার্স-এ লেখা পাঠান
হাতে লিখে নয়, টাইপ করে

ডুয়ার্স সংক্রান্ত আপনার কোনও লেখা থাকলে টাইপ করে পাঠান। আপনার লেখা সম্পাদকমন্ডলীর পছন্দ হলে এই পত্রিকায় তা ছাপা হবে। লেখার বিষয়বস্তুর উপর ছবি থাকলে অবশ্যই পাঠাবেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা এখন ডুয়ার্স। শান্তি পাড়া। অনিমা লজের পেছনে। জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১। অথবা মেল করতে পারেন নিচের মেল আইডি-তে editor.ekhonduars@ yahoo.com

এখন ডুয়ার্স
ডুয়ার্সের নিজস্ব বই ও পত্রিকা
পরিবেশ। পরিকাঠামো। পর্যটন
জঙ্গল। জনসত্ত্বা
শিক্ষা। স্বাস্থ্য। সাহিত্য। সংস্কৃতি

এখন ডুয়ার্স

ষষ্ঠ বর্ষ, ৪য় সংখ্যা, জুলাই ২০১৯

সম্পাদনা ও প্রকাশনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদনা
শ্বেতা সরখেল

অলংকরণ
শান্তনু সরকার

সার্কুলেশন
দেবজ্যোতি কর
দিলীপ বড়ুয়া

মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ইমেল
ekhonduars@yahoo.com

প্রচ্ছদ হিমালয়া বিশ্ব সংগ্রহালয়ের সৌজন্যে

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস।
অনিমা ভবন। শান্তি পাড়া।
জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এই সংখ্যায় যা আছে

সম্পাদকের চিঠি ২

উত্তরের উপকথা
অথাই পথাই ৬

বিশেষ রচনা
কড়া কীটনাশকেও মরছে না উত্তরের মশা ৮

রাজনীতির পাচন
বঙ্গ বিজেপি এখনও গ্যাসবেলুন! তবু মানুষের কাছে মাথা নত করবেন না? ১০

উত্তরে সেদিনের সেনাপতিরা
কোচবিহারে জনসমক্ষে প্রথম লাল ঝাণ্ডা উত্তোলন করেন জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী! ১২

উত্তরপক্ষ
চিরদুঃখী বিড়ি শ্রমিকের বারমাস্যা ১৩

ধারাবাহিক কাহিনি
তাজ্জব মহাভারত ১৫
মরা মৌমাছির চোখ ৩০

কভার স্টোরি
ডেস্টিনেশন বাগডোগরা মুখোশের মিউজিয়াম ২০

শ্রীমতি ডুয়ার্স
ভারতীয় নারীর গর্ভপাতের অধিকার ২২
আমার মেয়েবেলা ২৪
দীপলক্ষ্মী রাজকন্যা ললিতা ২৫

গল্প
নীল বাঘ ২৬

কবির কলমে
ডুয়ার্সের সাতকাহন ৩৩

পর্যটন
কেমন আছে লাটাগুড়ি? ৩৫

পাঠকের পর্যটন
বাশবটে ৪০

নিয়মিত বিভাগ
ফেসবুক পোস্ট ৪
খুচরো ৭
রাসায়নিক রস ৩৮

সেরা পোস্ট

ফিরে দেখা

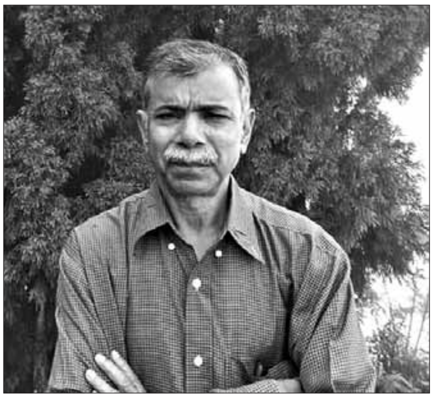

বিমান ঘোষ

সিগনাল না পেয়ে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে গেল। দূরে স্টেশন দেখা যাচ্ছে। বাঁ দিকে ধাপে ধাপে পাহাড় উঠে গিয়েছে। চা-বাগান, নানান রকম আকাশ ছোঁয়া গাছপালা শাখা প্রশাখা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। ডান দিকের জমি ধাপে ধাপে নেমে গিয়ে সমতলে মিশেছে। সেখানেও চা-বাগান, সবুজের সমারোহ। চা-বাগানের মাঝখান দিয়ে জাতীয় সড়ক। বাস লরি চলছে। স্টেশনের আগেই একটা ছোট্ট পাহাড়ী নদী। নেওড়া। সিগনাল এখনও লাল হয়ে আছে। পলাশের আর তর সইছে না। ট্রেন থেকে নেমে পড়ল। ট্রেন লাইন ধরে সামান্য এগিয়ে এক পায়ে চলা পথ পাহাড় থেকে নেমে এসে জাতীয় সড়কে মিশেছে। পলাশ ঐ পথ ধরেই বেশ কিছুটা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে পিচ রাস্তায় উঠল। সামনেই নেওরা নদীর উপর সেতু। সেতু পেরলেই একটু নেমে এগিয়ে গেলেই তার স্বপ্নভূমি। ছোট্ট পাহাড়ী শহর চালসা। শরীরের মধ্যে একটা অদ্ভুত শিহরন অনুভব করল সে। কত বছর, কত বছর পরে আবার এখানে এল সে।

পুজোর ছুটিতে কয়েক দিনের জন্য কর্মক্ষেত্র খড়গপুর থেকে বাড়ি এসেছে। কয়েকটা দিন ব্যাস্ততার মধ্যে কাটানোর পর আজ সকালে হঠাৎ ই ঠিক করল চালসা যাবে। শৈশবে কাটানো সেই দিনগুলোকে কয়েক ঘণ্টার জন্য যদি ফিরে পাওয়া যায়।

বাড়ির সামনেই রেল জংশন। সাতটায় ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস। চেপে বসল ট্রেনে। মোটামুটি ফাঁকা। জানালার পাশে সিট পেয়ে গেল। সিটে বসে বাইরের দিকে চোখ মেলে রইল। সামান্যতম কোনো দৃশ্যও যেন বাদ না যায়। তিন চারটা স্টেশন পেরিয়ে ট্রেন এসে দাঁড়াল গুলমা স্টেশনে। দিগন্ত বিস্তৃত চা-বাগান, সবুজ অরণ্যর মাঝখানে এই স্টেশনটাকে পলাশের খুব রোমান্টিক মনে হয়। বাঁ দিকে সবুজ মাঠ, বালি পাথরের মধ্যে বড় বড় শাল সেগুন আকাশ ছোঁয়ার প্রতিযোগিতায় মত্ত। তারপরেই পাহাড়। মৃদু হিমেল হাওয়ায় ভেসে আসছে উত্তুরে বুনো পাহাড়ী গন্ধ। মাঠে গরু মোষ চরে বেড়াচ্ছে। ভাগ্য ভাল বা খারাপ থাকলে হাতি, চিতার দেখাও মিলতে পারে। না, এখন অবশ্য সেরকম কিছু ঘটল না। অল্প কয়েক জন চা বাগানের শ্রমিক পুরুষ মহিলা ট্রেনে উঠলেন। ট্রেন ছাড়ল। মহানন্দা অভয়ারণ্যের মধ্য দিয়ে ট্রেন ছুটে চলল। সেবক, আর একটি অপূর্ব স্টেশন। এর পরই তিস্তা। উত্তরে দুই পাহাড়ের খাতের মধ্য দিয়ে রেল ব্রিজের আগেই তার গতি হারিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সমতলে। বালি পাথরের মাঝে কয়েকটি ধারায় বিভক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট ডান দিকে রেখে উধাও হয়ে গিয়েছে গজলডোবার দিকে।

হঠাৎ ই একটা গমগম আওয়াজের সাথে ট্রেনের কামরা পুরো অন্ধকার হয়ে গেল। আরে, এটাতো সেই টানেল। আরও একটা টানেল আছে বাগ্রাকোটের আগে। বাগ্রাকোট পার হয়ে ট্রেন এসে দাঁড়াল ওদলাবাড়ি। পলাশের মনে পড়ল অনেক দিন আগে এই স্টেশনে একটা সিনেমার শুটিং দেখেছিল। সৌমিত্র, মাধবী, হারাধন। সম্ভবত সিনেমাটার নাম ছিল কাপুরুষ ও মহাপুরুষ। পরিচালক ছিলেন সত্যজিৎ রায়। স্টেশনের ওপাশে রেলের মাল রাখার গুদাম। সেখানে কাঁচা হাতে বড় বড় করে লেখা Good Said. Goods Shed এর কি সুন্দর পরিণতি। দেখে ওর হাসি পেল।

ট্রেন ছাড়ল। গুলমার পর থেকেই ট্রেন পাহাড়ের কোল ঘেঁসে চলছে। বাঁ দিকে পাহাড়ের সারি। ঘন বন জংগলে ঢাকা। মাঝে মাঝে পাহাড়ী নদী। আর ডান দিকে চা-বাগান, ধান ক্ষেত, কাশ বন হাওয়ায় আন্দোলিত হচ্ছে। একটা হালকা নীলাভ কুয়াশার চাদরে ঢেকে আছে প্রকৃতি।

বাগ্রাকোট এর পর পাহাড় দূরে সরে গেল। ডামডিম, মাল জংশন পেরিয়ে ট্রেন এসে দাঁড়াল এই আউটার সিগনালে।

ছোট্ট পাহাড়ী নদী নেওড়ার ব্রীজ পেরিয়েই চালসা। তার স্বপ্নভূমি। তার ছোটবেলার অনেকগুলো দিন কেটেছে এখানে। ওর জ্যেঠামনি কাজ করতেন ডি ই সি তে। সেখানে চা-বাগানের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরী ও মেরামতির কাজ হত।

চালসায় ঢুকে রাস্তার মোড়ের একপাশে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল পলাশ। চারিদিক চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। পিছনে মেটেলি পাহাড়, আঁকা বাঁকা পিচ রাস্তা উপরে উঠে গেছে। ধাপে ধাপে চা বাগান। ঐ যে চালসা স্টেশন। ছোট্ট। যাত্রী সংখ্যা নগণ্য। ট্রেনটি আলিপুরদুয়ারের দিকে রওনা দিচ্ছে। প্লাটফরমে ছোট ছাউনি। কয়েকটি লোহার বেঞ্চ পাহাড়ের কোল ঘেঁসে বাসানো। একটা টিউবওয়েল। ছোট স্টেশন ঘর, টিকিট ঘর। পলাশ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে সোজা দক্ষিণে বন জংগল ভেদ করে লাটাগুড়ি ময়নাগুড়ির দিকে চলে গেছে বাস রাস্তা। বাঁ দিকে ল্যাটারাল রোড যা নাগ্রাকাটা বানার হাটের দিকে। আর ডান দিকের রাস্তাটি শিলিগুড়ি থেকে এসে এখানে মিশেছে।

পলাশের সামনেই এই মোড়ের মাথায় এক বিশাল কৃষ্ণচূড়া গাছ আজো দাঁড়িয়ে আছে। বহু দিন আগে গাছটির নিচে একটা খুঁটির উপর একটা কালো বোর্ড লাগানো ছিল। সেখানে একটা অদ্ভুত একটা ছবি লাগানো ছিল। ছেলেবেলায় বার বার দেখত সেই ছবিটা। সরু গোঁফ ওয়ালা লম্বা টুপি পরা একটা লোক, টুপির ভিতর থেকে দুটো সিগারেট বেরিয়ে আছে। নিচে লেখা পাসিংশো। টুপির উপর দু আঙ্গুলে ভি অক্ষরের মত সিগারেট কেন এ প্রশ্নের সমাধান সে তখন করতে পারে নি। আজ সেই লম্বা খুঁটিটা বা বোর্ডটা নেই। তবে খুব বেশি বদলায় নি চালসা। লাটাগুড়ির রাস্তার পাশে কয়েকটা করাত কল। সেখানে কাঠ চেরাই হচ্ছে। অদ্ভুত একটা সোঁ সোঁ আওয়াজ ভেসে আসছে। এদিকে মুদিখানা, মনোহারি দোকান, রাস্তার ওপারে মোড়ের মাথায় একটা বেশ বড় চা মিষ্টির দোকান। নতুনত্বের মধ্যে একটা ওষুধ দোকান, ফোটোকপির দোকান, টেলিফোন বুথ ইত্যাদি। এছাড়া চালসা মোটামুটি একই আছে। সেই পঞ্চাশ বছর আগে যেমন দেখেছিল।

কি মনে হতে টেলিফোন বুথে ঢুকল ও। সেখান থেকে খড়গপুরে এক বন্ধুকে ফোন করল। ওর অনুভূতির কথা জানাল। বুথে ফোনের পয়সা দেবার সময় বুথের ভদ্রলোক পলাশকে জিজ্ঞেস করল, আপনি আগে চালসায় এসেছিলেন। আগে তো আপনাকে দেখিনি।

—হ্যাঁ, সে অনেক দিন আগেকার কথা।

—কত বছর হবে?

—প্রায় পঞ্চাশ বছর। বাষট্টি তেষট্টি সালে আমরা এখান থেকে চলে যাই। তার আগে বেশ কয়েক বছর এখানে ছিলাম। আমার ছোটবেলার অনেকগুলো দিন এখানে কেটেছে। চালসার প্রতি একটা টান রয়ে গেছে তখন থেকেই।

—তখনকার কারো কথা আপনার মনে আছে?

—দু এক জনের কথা মনে আছে। আমার এক বন্ধু ছিল অমল। ওর বাবা ডুয়ার্সের হাটে হাটে মশলা বিক্রি করতেন। ওর মাকে আমরা পিসিমা বলতাম।

—অমলদাকে আমি চিনি। একটু আগেই অমলদা বাসে করে লাটাগুড়ির দিকে গেলেন। একটু আগে এলে ওর সাথে আপনার দেখা হত।

—ঠিক আছে, আমি বোধহয় ওদের বাড়িটা চিনতে পারব। এখন ওখানেই যাবো।

—আপনারা বাষট্টি তেষট্টি সালে এখান থেকে চলে গিয়েছেন। আমার জন্ম উনসত্তর সালে। আপনার সাথে আমার দেখা হবার কোনও সম্ভাবনাই নেই, বলে লোকটি হাসতে লাগল।

—ঠিক ভাই। পলাশের চোখে পড়ল পাহাড়ের উপর লাল টিনের ছাউনি দেওয়া একটা বাড়ি। সেদিকে নির্দেশ করে সে বলল, ওটা বোধ হয় প্রাইমারী স্কুল। আমি এক বছর ওখানে পড়েছি। মনে হয় স্কুলটার নাম শালবনী প্রাথমিক বিদ্যালয়। ঠিক মনে নেই।

—হ্যাঁ স্কুলটা এখনও ওখানেই আছে। আপনি ওখানে পড়েছেন জেনে ভাল লাগল। আমিও ওখানে পড়েছি।

—ঠিক আছে ভাই। এখন আসছি। পারলে ফেরার সময় দেখা করে যাব।

পলাশ বুথ থেকে বেরিয়ে আসে। বাইরে সব অচেনা মুখ। হয়তো ছোটবেলায় এদেরই কারো সাথে খেলেছে। এক স্কুলে পড়েছে। এখন কেউ কাউকে চিনতে পারছে না। পলাশ মনে মনে একটু ভাবল। সামনের দিয়ে একটু এগিয়ে দেখতে পেল বালি পাথরের সেই কাঁচা রাস্তা। ডান দিকে পাহাড়ের একটা ধাপ।

বুনো গাছপালায় ঢাকা। উপরের দিকে কয়েকটা পাকা বাড়ি। বাঁ দিকে প্রথম বাড়িটার পরে একটা পাকা বাড়ি। অনেক পুরানো। এটাই বোধহয় বাপি লাহিড়ীর মামা বাড়ি। ছোটবেলায় ওকে দেখেছে শার্ট হাফপ্যান্ট পরা। মায়ের পাশে বসে গানের সাথে তবলা বাজাত। পলাশ নিজেও তখন ওরকমই ছিল। ওপথে একটু এগোতেই ডিইসি র সাইন বোর্ড দেখতে পেল। এইতো। এর পরে একটা বাড়ি ছেড়ে দিলেই অমলদের বাড়ি। তার দু একটা বাড়ি পরেই ওর জেঠামনির কোয়ার্টার। সবই প্লাঙ্কিং করা কাঠের বাড়ি। ওপরে ঢেউ খেলানো টিনের চাল। ডিইসি র সামনে এসে একটু দাঁড়াল। কত কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কারখানার ওপাশে বড় বড় কাঠের গুড়ি পড়ে থাকত। বিকেল বেলা খেলা শেষ হলে ওরা ঐ গুড়িগুলোর উপর উঠে বসত। নানান রকম গল্প করত। চা বাগানের মদেশিয়া নারী পুরুষেরা মেঠোসুরে গান গাইতে গাইতে তাদের বাসায় ফিরে যেত। কারখানায় ধুমধাম করে বিশ্বকর্মা পুজো হত। ছোড়দি, বেনুদি এঁরা পুজোর সময় কোন শিল্পী কি গান গাইবেন তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। বিশ্বকর্মা পুজোতেই শারদীয়া পুজোর গান প্রকাশিত হত। ছোড়দি খুব সুন্দর গান গাইত। ডিইসি র সামনে থেকে এগিয়ে গেল পলাশ। একটা বাড়ি ছাড়ার পরই সেই বাড়িটা। বুক সমান উঁচু শালের গাছের গুড়ির উপর কাঠের পাটাতন। তার উপর কাঠের বেড়া দেওয়া টিনের চালওয়ালা বাড়িটা। পঞ্চাশ বছর আগের দেখা ছবিটার সাথে মেলাতে চেষ্টা করল। পুরোটা মিলল না। বাড়িটা একদিকে সামান্য হেলে পড়েছে। কাঠের দেওয়ালের তক্তা একটা দুটো খুলে ঝুলছে। কেমন একটা হতশ্রী চেহারা। সামনের দিকে অযত্নে লালিত বাগান। সেখানে ঝোপের আড়ালে গোলাপ, রঙ্গন, টগর ফুটে আছে। গেটটার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। ভেতরে কেউ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকল। একটু অপেক্ষা করে গলা চড়িয়ে ডাকল, ভেতরে কেউ আছেন?

—কে? ভেতর থেকে সাড়া এল।

—আমি পলাশ। আমাকে চিনবেন না। একটু বাইরে আসবেন?

—আসছি। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়সী এক যুবক নেমে এল। ফর্সা গোলগাল চেহারা। মাথায় সামান্য টাক। পরনে ঢোলা হাফপ্যান্ট। সুন্দর চেহারা। চোখে জিজ্ঞাসু চাউনি। আপনি?

—আমাকে চিনবেন না। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে আমরা এখানে থাকতাম তখন আমার দশ এগারো বছর বয়স হবে। আমার এক বন্ধু ছিল এখানে। তার নাম অমল মিত্র। তার মাকে আমরা পিসিমা বলতাম। এটা কি তাদের বাড়ি?

—হ্যাঁ, অমল আমার দাদা। আসুন, ভিতরে আসুন। আমার নাম বিমল।

পলাশ ওর সাথে বাড়ির ভিতরে যায়। নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ঘরে এসে ঢোকে। খাটের উপরেই বসে। চারিদিকে দারিদ্রের ছাপ স্পষ্ট। ওপাশে আর একটা দরজা খোলা। সেখান থেকে দেখতে পায় পরিষ্কার উঠোন। উঠোনের একপাশে রান্না ঘর, বাথরুম। বাধানো কুঁয়োর পাড়। কুঁয়োর পরে আম কাঁঠাল গাছের বাগান। বিমল গায়ে একটা শার্ট চড়িয়ে ওর সামনে রাখা একটা টুলের ওপর বসল।

—বলুন।

—না এমনিই। কোনো বিশেষ দরকার কিছু নেই। আসলে ছোটবেলায় কাটানো জায়গাটা দেখতে আসা। আর ছোটবেলার দু একজন বন্ধুর নাম মনে আছে। যদি তাদের সাথে দেখা হয়। যদি তারা চিনতে পারে!

—আপনি যে সময়ের কথা বলছেন তখন আমার জন্মও হয় নি। তবু ছোটবেলার টানে আপনি এখানে এসেছেন, ভালো লাগছে। আপনিই বলুন সে সময়ের কথা।

—আমার জেঠামনি ডিইসি তে চাকরি করতেন। ম্যানেজার ছিলেন। আমার ছোটবেলার তিন বছর এখানেই কেটেছে। আপনার মায়ের নাম বোধহয় সবিতা। আমার ছোট পিসিমার নামও সবিতা। সেজন্য আমরা আপনার মাকে সবিতা পিসি বলে ডাকতাম।

বিমলের মুখটা একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আপনি আমার মাকে দেখেছেন। মনে হচ্ছে আপনি আপনার যে জেঠামনির কথা বলছেন, তিনি আমাদের শচীন মামা। তাকে আমি দেখিনি। তবে মায়ের কাছে আপনাদের অনেক কথা শুনেছি। শুনেছি তিনি আমাদের নিজের মামার মতই ছিলেন।

পলাশ বলল, সে সময় আমরা এখানে একটা বেল গাছের তলায় বৌ বসন্ত, গোল্লাছুট, কানামাছি খেলতাম। অমল, প্রকাশ, বেনুদি, ছোড়দি, ছোড়দা আমি সবাই একসাথে খেলতাম। আর খেলার শেষে প্রায় প্রতিদিনই প্রকাশ ঝোপের মধ্য থেকে দু একটা বেল কুড়িয়ে আনত। আমরা বলতাম ও বাড়ি থেকে বেল নিয়ে এসে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখত। আর খেলার শেষ কুড়িয়ে আনার ভান করত। তাই নিয়েও খুব মজা হত।

—প্রকাশ ? মানে আপনি কি প্রকাশ চক্রবর্তীর কথা বলছেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রকাশ চক্রবর্তী। তোমাদের বাড়ির উল্টো দিকে, সম্ভবত ঐ বাড়িটা ওদের ছিল। খোলা জানালা দিয়ে রাস্তার ওপাশে একটা বাড়ি দেখিয়ে পলাশ বলল।

—হ্যাঁ, ওটাই প্রকাশদার বাড়ি। প্রকাশদা স্কুলে চাকরি করতেন। চার পাঁচ বছর হল, ময়নাগুড়ি থেকে ফেরার সময় বাস এক্সিডেন্টে মারা গেছেন।

শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল পলাশের। চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। বিমল টুল থেকে উঠে ভিতরের ঘরে গেল। একটা কৌটো হাতে ফিরে এল। বলল আমার স্ত্রী একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজ করে। ও কাজে বেরিয়ে গেছে। আমি কাঠের ছোটখাট ব্যবসা করি। দুপুরে আপনাকে এখানে খেয়ে যেতে বলতে পারতাম। কিন্তু ঘরে সেরকম কোনো ব্যাবস্থাই নেই। বলে কৌটো খুলে এক চামচ চিনি পলাশের হাতে দিল। বলল, এটি খেয়ে নিন। আমি জল নিয়ে আসছি। আপনাকে এক কাপ চা-ও দিতে পারলাম না। খুব খারাপ লাগছে।

একটা ঝকঝকে কাঁসার গ্লাসে জল নিয়ে এল বিমল। পলাশ চিনিটুকু খেয়ে গ্লাস থেকে জল খেল। পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল। বেশ মিষ্টি। বিমলের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হল সে।

—এবার বলুন আপনি কোথায় থাকেন। কি করেন।

—আমাদের বাড়ি শিলিগুড়ি শহরে। আমি কর্মসুত্রে খড়গপুরের থাকি, ওখানে আইআইটি তে চাকরি করি। সাইত্রিশ বছর ওখানে আছি। বছরে দু এক বার বাড়ি আসি। আচ্ছা, সবিতা পিসি কোথায়? তাঁকে তো দেখছি না।

—মা তো অনেকদিন আগে মারা গেছেন। বাবা মারা যাওয়ার দু বছর পরেই মা চলে গেলেন। তা প্রায় বারো বছর হতে চলল।

—আর অমল? ও কি করছে?

—দাদাও আমার মত কাঠের ব্যবসা করে। কোনোক্রমে চলে যায়। দাদা আলাদা বাড়ি করেছে। আমাকে এই বাড়িটা ছেড়ে দিয়েছে।

—বেনুদি কোথায় আছেন? ওর সাথেই আমার বন্ধুত্ব বেশী ছিল।

—দিদি এখানেই বাড়ি করেছেন। দিদি এখন ঠাকুরমা হয়ে গেছেন। ওর ছেলে জলপাইগুড়িতে চাকরি করে।

—আচ্ছা, আমরা ছোটবেলায় যেখানে খেলতাম সেই জায়গাটা দেখতে চাই। ওখানে একটা বেল গাছ ছিল। আর জেঠামনির কোয়ার্টারটাও দেখব।

—চলুন আমার সাথে। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

বিমলের সাথে পলাশ বেরিয়ে আসে। বিমল একটা শাড়ির পাড় দিয়ে বাগানের গেট বেঁধে দেয়।

—ঘরে তালা দিলে না।

—নাঃ, এখানে চুরি টুরি বিশেষ হয় না।

ওরা দুজন সামান্য হেঁটে সামনের একটা ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়াল। একদিকে অনেকগুলো কাঠের গুড়ি জমা করা আছে। ওদিকে পাহাড়ের একটা ধাপের উপর সুদৃশ্য নতুন তৈরি বাড়ি ঘর। জানালায় কাঁচ দেওয়া। ফাঁকা জায়গাটা ছোট ছোট বুনো গাছে ঢাকা। ভাটি ফুল গাছ। বসন্তে সুন্দর সাদা ফুল ফোটে। সুগন্ধে চারদিক ম-ম করতে থাকে। নরম চওড়া পাতা। মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক প্রাচীন বেল গাছ। ডালপাতা ছড়িয়ে সবুজ পাতা মেলে পলাশের অপেক্ষায়। যেন ওকে ডাকছে।

আয়, আয়, আমার ছোটবেলার বন্ধু, কাছে আয়।

পলাশ পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় গাছটার দিকে। বিমল দাঁড়িয়ে থাকে। পলাশ বেল গাছটিকে স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে থাকে। অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ঐ খানে প্রকাশ প্রতিদিন বেল কুড়িয়ে পেত। এই জায়গাটায় একদিন গোল্লাছুট খেলবার সময় বেনুদিকে জড়িয়ে ধরে আছাড় খেয়েছিল। ঐ কাঠেরগুড়ি গুলোর উপর বসে ওরা গল্প করত। ছোড়দি গান গাইত, মায়াবতী মেঘে এল তন্দ্রা...। আজ প্রকাশ নেই, বেনুদি হয়ত ঠাকুমা দিদিমা হয়ে পক্বকেশ বৃদ্ধা হয়ে গেছেন। অমলের সাথে দেখা হল না। লাটাগুড়ি গিয়েছে।

পলাশের চোখ জলে ভরে গেল। গলার কাছে একটা বাষ্প আটকে আছে। ধীরে ধীরে গাছটির গোড়ায় বসে একটা প্রণাম করল। বিমল দাঁড়িয়ে আছে, তাকে দেখছে। কাছে এসে বলল, চলুন শচীন মামার বাড়িটা দেখবেন। ফেরার পথে ওদের বাড়ির আগে একটা ঝোপজংগলে ঢাকা পরিত্যক্ত ভাঙ্গাচোরা কাঠের বাড়ি দেখিয়ে বিমল বলল, মায়ের কাছে শুনেছি, এখানেই আপনারা থাকতেন। পলাশ এখান থেকেও একটু মাটি তুলে মাথায় দিল।

সবিতা পিসি নেই, জেঠামনি নেই, মণিমা নেই, বাবা নেই, মা নেই, ভাই নেই, প্রকাশ নেই। নেই এর তালিকাটা দীর্ঘ হয়ে আসছে দিনের পর দিন। মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে আসছে। বলল, বিমল চলো, এবার ফিরব। পরে যদি সময় পাই আবার আসব। তুমি আমাদের শিলিগুড়ির বাড়িতে এসো একদিন। অমলকে আমার কথা বোলো। আর বলতে পারল না। গলা বুজে আসছে।

বিমল ওর সাথে বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত এল। এখান থেকে ফেরার বাস ধরবে। ঐ দিকে লাটাগুড়ি, এই দিকে শিলিগুড়ি। পাহাড়ের কোলে ছোট অথচ সুন্দর রেল স্টেশন। একই রকম আছে। একটুও পালটায় নি। প্রিয় চালসা, সারা পৃথিবী বদলে গেছে। তুমি বদলাও নি। আমার শৈশব বুকে ধরে তুমি একই রকম আছো। এরকমই থাকো অনন্তকাল। আমি আবার আসব তোমার কাছে।

লাটাগুড়ির দিক থেকে একটা বাস এসে দাঁড়াল। বিমল বলল, দাদা, আবার আসবেন। বাস ছেড়ে দিল। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে পিচ রাস্তা ধরে। চালসা পিছনে পড়ে রইল।

বন্ধুদের সেরা পোস্ট

'এখন ডুয়ার্স' ফেসবুক প্রোফাইলে তালিকাভুক্ত বন্ধুদের পোস্ট থেকে বাছাই করা কিছু লেখা ও ছবি পত্রিকার পাতায় ছাপার পরিকল্পনা থেকেই এই বিভাগের আবির্ভাব। সেরা পোস্ট নির্বাচন একান্তই সম্পাদকীয় সিদ্ধান্ত। তবে পোস্টে কোনওরকম কলম চালানো হয় না। এমনকী বানানও অপরিবর্তিত রাখা হয়। নির্বাচিত পোস্ট ছাপার বিষয়ে বন্ধুকে সবসময় অগ্রিম জানানো সম্ভব হয় না। তাই আগে থেকেই অভিনন্দন জানিয়ে রাখি সবাইকে।

অথাই পথাই

'আবো' কাদের পদবি হয়?

জিজ্ঞেস করতে হেসে ফেলেছিলেন গাঁয়ের বৃদ্ধা। বুঝিয়ে বলেছিলেন, রাজবংশী সমাজে 'আবো' কথার অর্থ মাওয়ের মাও অর্থাৎ দিদিমা। এই লোককথাটির কথক উত্তরবঙ্গেরই একজন আশি উর্দ্ধ মহিলা। তিনি গোটা গ্রামের 'আবো'।

স্মৃতি অনেক ফাঁকি দিল তবু যতটুকু মনে করতে পারলেন, উদার উচ্চারণে বলে গেলেন। চলনসই মফস্বলে আজকাল পিচরাস্তা ধরে সাইকেল টোটো অটো মোটরগাড়ি দিনমান ছুটছে। এই রাস্তাঘাটের পূজাব্রতের উত্তরবঙ্গীয় নাম অথাই-পথাই। বৃষ্টিবাদলায় গ্রামের পথঘাট সুরক্ষিত রাখার লৌকিক দেবার্চনা। রথের দিনে পথের ব্রত— অথাই-পথাই।

এই পুজো করতে কী কী লাগে? রাস্তার চৌমাথা লাগে, বাঁশের ডাঁটওয়ালা ছাতা লাগে, বেণা ঘাস, রাখালের হাতের পাচন লাঠি, দু'চারটি ফলমুল আর—

আর? আমি প্রশ্ন করি।

লাজুক মুখে গাঁওয়ালি আবো উত্তর করেন, 'আর কবার নাগে এইখান কিচ্চা'

(আর বলতে হয় এই গল্পটি)।

প্রাচীনাকে শ্রদ্ধা জানাতে এই লোককথাটিই প্রথমে রাখলাম।

সুখুনি-দুখুনি দুটি বোন। সুখুনি ভারি কর্কশ। তার বয়স আট পেরিয়ে গেছে কিন্তু সে যেমন ঝগড়ুটে তেমনই দুর্মুখ বলে এখনও শ্বশুরঘর জোটেনি। দুখুনি সাতে পড়েছে। শান্ত লক্ষ্মী স্বভাবটি তার চেহারার লাবণ্যের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে রয়েছে।

একদিন তারা হাটে যাচ্ছে। রথযাত্রার বিকেল। নির্জন গ্রামের পথে যেমন কাদা তেমনি বাঁশ, শিয়াকুল, আকন্দ, বনকাটুসের জঙ্গল। সাপখোপ তো বটেই, দ্যাও পেত্যানির ভয়ও পদে পদে হাঁ মেলে আছে। বেলাবেলি হাট সেরে আসাই মঙ্গল।

চলতে চলতে দুখুনি বলল, আচ্ছা দিদি, এই আমি যেমন রথের হাটে যাবার আনন্দে পথ হাঁটছি, তুই কার বলে হাটে যাচ্ছিস? রথের না পথের?

শ্রাবণ মাসের মেজাজের ঠিক নেই। যে কোনও সময় বৃষ্টি আসতে পারে আন্দাজ করে সুখুনি একখানা ডাঁটওয়ালা ছাতা বগলে নিয়েছে। বোনের কথায় আকাশপানে একবার তাকিয়ে সে বলল, নিজের পা থাকতে পরের জোরে হাঁটব কেন শুনি? মুই নিজের বলে নিজের সুখে যাছ।

যেই না বলা, অমনি কী কান্ড! সুখুনির হাত পা অসাড় হয়ে গেল। চলা তো দূর, নড়তেও পারছে না আর। অগত্যা দু'বোন জড়াজড়ি করে পথের মাঝে বসে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

এমন সময় সেই পথ দিয়ে যাচ্ছে এক রাখাল। সা'জোয়ান চেহারা, ভোমরা কাজল রং, বাখারি চাঁছা চোখমুখ, খাটো ধুতির খুঁটে গোজা পাচনলাঠি। সুখুনি দুখুনিকে কাঁদতে দেখে সে এসে বলল, তা ভালোমানুষের মেয়েরা, এভাবে কাঁদছ কেন গা?

কার আগে কে বলবে, সুখুনি দুখুনি কলকল গলগল করে বিপদখানা রাখালকে উগরে দিল। রাখাল বলল, অথাই পথাই সেবা করো, সব ঠিক হয়ে যাবে। পথেরও দেব্তা আছে জানো তো? তেনার সন্তুষ্টি হলে অপথও সুপথ হয়।

সুখুনি মুখ বেঁকিয়ে দিল। পায়ের জন্য বদ্যি না মালিশ না, পুজো করার নিদান। দুখুনি দেখল এখন ভারি বিপদ। রাখালকে দিয়ে যদি সুরাহা হয় তবেই বাঁচোয়া। কিন্তু ভাইও, আমরা তো এ পুজো করতে জানি না। কী হবে?

রাখাল হাসল, আমাদের আভীরপল্লীতে অনেক মেয়ে এ পুজো করে। আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এখানে নয় ওই চৌমাথায় চলো।

সামান্য দুরেই চারটি পথ চারদিক থেকে এসে একখানে নিজেদের ছুঁয়ে আবার চারদিকে রওনা হয়েছে। রাখাল সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। দুখুনিও পাঁজাকোলা করে সুখুনিকে তুলে নিয়ে রাখালের সামনে হাজির। তারপর রাখালের কথামত ছাতাখানা মেলে দিল চৌমাথার মাঝখানে আর পুজোর টুকিটাকি জোগাড় করল আশপাশ থেকে।

নিলমনে ডুমুর লাগবে, বলেই রাখাল ঢুকে গেল জঙ্গলে। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই ফিরে এল একমুঠ ডুমুর নিয়ে। যত্ন করে সাজিয়ে দিল নৈবেদ্য। দুখুনি শান্ত হয়ে বসে পথের দেবতাকে ভক্তিভরে পুজো করল। কেমন দেবতা জানে না, কিন্তু করল।

রাখাল বলল, এবারে প্রসাদ দাও।

দুটো ফল নিয়ে দুখুনি এগোতে যাবে, রাখাল বলল, তুমি নয়, যার বিপদের জন্য পুজো হল সে প্রসাদ দেবে।

কিন্তু দিদির তো পা অবশ, উঠতে পারছে না, আমার কাছ থেকেই নাও।

থাক তবে। প্রসাদে কাজ নেই। আমি চলি।

কী আর করে, গায়ের সব শক্তি জড়ো করে বোনের হাত ধরে ওঠার চেষ্টা করল সুখুনি। কী আশ্চর্য! দিব্যি দাঁড়াতে পারল। তারপর এক পা, দু' পা, জোড় পা, বিজোড় পা— এগোতে লাগল। দু'বোন আনন্দে হেসে কেঁদে সারা। এ ওকে জড়ায়, ও তাকে আদর করে।

হঠাৎ তাদের সম্বিত ফিরল। রাখাল? রাখাল কোথায় গেল? ইতি উতি খুঁজল দু'জন। কোথাও নেই রাখাল। এই নির্জন গ্রামপথে, সন্ধে নামার মুখে রাখাল যেন ভোজবাজির মতন মিলিয়ে গিয়েছে।

নোখোলিয়া— ! কাঁদো কাঁদো গলায় ডেকে উঠল দুখুনি।

কেউ সাড়া করল না। আকাশে গুড়গুড় ডাকছে মেঘ, হাটের পথ ভুলে দুই বোন তাড়াতাড়ি বাড়িমুখে হাঁটা দিল।

সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য

খুচরো ডুয়ার্স

কাটমাণিক্য

প্রথমে বৈদ্যবিদ্রোহ তাহার পর কাট মানি— জোড়া উত্তেজনায় কলিকা সমিতির আসর গম গম করিতেছে। গরম দাপাইয়া বেড়াইতেছিল কিন্তু মহাতামাক সেবনের পর কী গরম কী শীত— সব ধম্মের ওয়েদার এক হইয়া যায়। সমিতিতে যাহার চুপচাপ পদ্মমধু খাইতেন, ইদানিং তাঁহারা প্রকট হইয়াছেন। ফলে সমিতির আটচালায় সর্বক্ষণ টক-শো চলিতেছিল। তৃণমধুকরেরা চারিদিকের ঘটনায় কিঞ্চিৎ ভেবলু হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বারুদ ভিজিয়া গিয়াছে। আমি তাঁহাদের একজনকে আড়ালে ডাকিয়া কহিলাম, কী হে? বসিয়া বসিয়া হাসিমুখ করিয়া বাক্যবাণ খাইতেছ কেন?

শুনিয়া তাঁহারা যাহা বলিল তাহা চিন্তার কথাই বটে! মহাদিদি খেপিয়া আগুন! কাহার কখন পদ গজাইতেছে কাহার ঝরিয়া যাইতেছে বুঝা মুশকিল! কোচরাজ্যের সূর্যবাবুর অর্ধেক অস্তে গিয়াছে! ছোটসূর্য মেঘের আড়ালে। অবতারবাবু সভার ভার পাইয়াছেন ঠিকই কিন্তু তাঁহাকে কোচরাজ্যের গ্রামগ্রামান্তরে পদ্মডাঁটা লইয়া প্রজারা তাড়া করিতেছে। মহানগরী হইতে কোনও এক দিগদর্শক আসিয়াছিলেন— তাঁহাকেও কুকথা শুনাইয়াছে। কলকেতার আর্টিস্ট বলা সত্ত্বেও ছাড়ে নাই।

কহিলাম, কোচরাজ্যের কথা ছাড়। তথায় নিশির ডাক শুনিয়া তোমাদের মাথা ঘুরিয়াছে। তা আলিনগরের সুগন্ধ মহারাজের খবর তো ভাল? শুনিয়া সে রাগিয়া বেগুনি হইয়া তারস্বরে কহিল, তিনি প্রজাদের বিষয়ে বিশ্বাসঘাতক তত্ত্ব খাড়া করিয়া আমাদিগের (অসংসদীয় শব্দ) মারিয়াছেন! দৈনিক পত্রে বৈকুণ্ঠপুরের সুখিবাবু তাঁহার প্রতি গণধোলাই মার্কা রচনা লিখিয়া লোক খেপাইতে বাকি রাখে নাই। উহার কথা কহিবেন না!

এইবার জিগ্যাসিলাম, কাট মানি বিষয়ে পদ্মরা খুব চাটিতেছে, তাই না?

তিনি জবাবে অসংখ্য অসংসদীয় শব্দ বলিয়া বিড়ি ধরাইলেন। সত্যি! মহারাজা কাটমাণিক্যের দল চাপে পড়িয়াছে বটে!

টাইগার জিন্দা থে

সমিতির এক ছোকরা সদস্য জিজ্ঞাসিল, আচ্ছা, সোঁদরবনের রয়াল টাইগার মরার পর কী হয়? কহিলাম, ভূত হয় কি? সদস্য হাসিয়া কহিল, চামড়া হয়ে ডুয়ার্সে আসে। রহস্য আমার ভাল লাগে না। সন্ধান করিয়া জানিলাম রয়াল বাঘার স্কিন নাকি সত্যিই ধরা পড়েছে অসম সীমান্তে। গম্মেন্টের লোক ফাঁদ পাতিয়া কতিপয় বগাকে ধরিয়া চামড়া ছাড়াইয়াছে— মানে চামড়া উহাদের হেফাজত হইতে লইয়াছে। বাঘ সোঁদরবনে মরিলেও চামড়া হইল অবিনশ্বর। তাহা নেপাল যাইত। তাহার পর কোথা যাইত কে জানে, কিন্তু যায় নাই। তাহলে কি চামড়া এবার বাঘকে ফেরৎ দেওয়া হইবে? তাহা সম্ভব নহে। মহাকবি পুরন্দর ভাট তো বলিয়াই গিয়াছেন—

জন্মিলে চামোড়া হবে।
চামোড়া অমর রবে।।

ভিটামিন এবসেন্ট

সংক্ষেপে ইহাই নাকি ভিটামিন-এ বলিতে জলপাইগুড়িতে বুঝাইতেছে। শুনিয়া ধন্ধ লাগিয়াছিল। ঘনরাম কোবরেজকে জিজ্ঞাসিতে সে কহিল, বাচ্চা-কাচ্চাদের ভিটামিন-এ খাওয়াইলে চোখের জোর বাড়ে। হাসপাতালে বিনি পয়সায় খাওয়ায়। মাস ছয়েক হইল সদর হাসপাতালে মিলছে না। বাইরেও নাকি বাড়ন্ত। অতঃপর বুঝিলাম, এ না কহিয়া এবসেন্ট কেন কহিতেছে। কিন্তু ভিটামিন অনুপস্থিত হইল কেন? যাহারা খাদ্যপ্রাণ -অ (সংস্কৃতায়িত চেহারা) আনিয়া দিত, তাহার পাইতেছে না। কেন পাইতেছে না? খাদ্যপ্রাণ - অ কি রেডিয়াম না হীরক? কিন্তু ইহার জবাব পাইলাম না। ভাবিলাম সরকারি ভিটামিন পলিসির ফাঁকফোকর লইয়া বিরোধিদের জিজ্ঞাসিলে আসল খবর পাইব। কিন্তু অনুপস্থিত ভিটামিনের কথা শুনিয়াই জনৈক বিরোধি কহিতে লাগিল, বাঙলার কি অবস্থা! জয় শ্রীরাম! এরা বাচ্চাদের দৃষ্টি নষ্ট করতে চায়! জয় শ্রী—! ভাবুন! বাঙলার পরবর্তী প্রজন্ম অন্ধ হয়ে যাবে! জয়—! ভিটামিন আমরা খাওয়াব! জ—!

পদবৈচিত্র্য

সরকার কেবল পদ দেয় না। পদের নিমিত্ত জুতাও দিয়া থাকে। পাঠশালার বালক-বালিকারা দ্বিপদী। সরকার তাঁহাদের জুতা দেয়। পরিবার নিমিত্তেই দিয়া থাকে। কিন্তু জুতা দিলেও দিত চার-পাঁচ রকম সাইজে। তাহাতে চার-পাঁচ পদ সাজাইয়া দেওয়া সম্ভব হইলেও পড়ুয়াদের পদবৈচিত্র্য অন্ততঃ আট প্রকার হওয়ায় ঝামেলা হইতেছিল। ফলে কেহ জুতায় পা ঢুকাইবার নিমিত্তে কুস্তি করিত, কেহ আবার কাপড় গুঁজিয়া পা হইতে জুতা ছুটিবার সম্ভাবনা রোধ করিত। জুতা পরিয়া জুৎ না পাইলে কি পাঠশালায় মন বসে? পদযুগল যদি জুতার ফাঁদে হাঁসফাঁস করে অথবা জুতার স্পেসে হারাইয়া যায় তবে রবি ঠাকুরের জুতা কাহিনি বুঝিবে কী ভাবে? তাই সরকার জুতার মাপে বৈচিত্র্য আনিয়াছে। অষ্টপ্রকার সাইজ সমন্বিত জুতা পাঠাইতেছে পাঠশালায়। শিলিগুড়ি শিক্ষা জিলায় তাহা নাকি আসিয়াছে এবং পায়ে জুতা জুতিয়া পড়ুয়াগণ অযুত আনন্দ লাভ করিয়াছে। তবে সরকার জুতো দান করিলেও গরু মারে নাই।

নারিকেলেংকারি

হানা দিয়া বলপূর্বক চাউল, ডাউল, ধান্য, ভুট্টা খাইত— ঠিক ছিল। সুপারি গাছ ভাঙিয়া খাইত, তাহাও মানা যায়। কিন্তু নারিকেল গাছ খাইবে— ইহা কে জানিত? হাতির ভোজন তালিকায় নতুন মেনু যুক্ত হইয়াছে শুনিলাম। হাতি এখন নারিকেল গাছ খাইতেছে। রঙ্গালিবাজনায় কোনও এক গেরস্তের আঙিনায় প্রবেশ করিয়া হাতি এই নতুন মেনু চাখিয়া বনবিজ্ঞদের চুল খাড়া করিয়া দিয়াছে! ডুয়ার্সের হাতিমন্ডল যদি ইহাতে উৎসাহিত হইয়া দিন প্রতি লাঞ্চে একখানি করিয়া নারিকেল গাছ খাইতে শুরু করে তবে নারিকেলশূন্য হইতে কতক্ষণ? অবশ্য কেহ কেহ বলিয়াছে গরমের কারণে হাতি ডাবের জল খাইবে ভাবিয়াছিল। কিন্তু গাছ হইতে ডাব না পাড়িয়া ডাবসুদ্ধ গাছ খাইয়া শর্টকাটে কাজ সারিয়াছে। কী জানি কত্তা! কী সব দিনকাল পড়িয়াছে! হাতিরা নারিকেলেংকারি করিলে বিজয়ায় নাড়ু বানাইব কী করিয়া?

যাহা হউক। এইবার সমিতির মাসিক বিতর্কসভার বিষয় ছিল 'স্বেচ্ছায় না ভয়ে, হরিণ লোকালয়ে'। এতদিন জঙ্গল হইতে হাতি লোকালয়ে আসিত তোলা তুলিতে, চিতা মুরগি খাইতে, বাইসন গুলি খাইতে এবং গন্ডার সঙ্গী খুঁজিতে। ইদানীং হরিণও আসিতেছে। কিন্তু তাহারা ভয়ে আসিতেছে না স্বেচ্ছায় আসিতেছে— ইহাই ছিল বিতর্কের বিষয়। বক্তাদের কিছু কিছু বাক্যরত্ন তুলিয়া দিলাম। সিদ্ধান্ত আপনাদিগের।

মর্টার মালহোত্র (অবসরপ্রাপ্ত সেনা)— চিতা-হরিণের সম্পর্ক খাদ্যখাদকের। খাদক লোকালয়ে আসিলে খাদ্য কেন আসিবে না। নো ফোর্সফুল আর্বানাইজেশন অফ ডিয়র।

মদন ডি কাম্যু (হবু পর্ন ডিরেক্টর)— শট ওয়ান। ফাঁকা জঙ্গল। শট টু। নো গ্রাস। শট থ্রি। অনশনরত হরিণ। শট ফোর। হরিণ টোটোয় উঠছে। মৃত্যুভয়। হরিণরা মৃত্যুভয়ে আসছে।

চঞ্চলা চ্যাটার্জি (নবীন নিউজ অ্যাঙ্কার)— ঘাস নেই— এ কথার মধ্যে কিন্তু আমরা অন্যরকম একটা মানে পাচ্ছি। ঘাস নেই মানে কি ঘাসফুল নেই? হরিণ কি লোকালয়ে এসে বলতে চাইছে পালাবদল আসন্ন? তাই যদি হয় তবে হরিণ স্বেচ্ছায় জঙ্গল ছেড়েছে। ছেড়েছে, কারণ লোকালয়ে পদ্ম ফুটছে!

নিষাদ গুপ্ত (শাসকপন্থী গায়ক)— পদ্ম ফুটছে মানে? হরিণ কি লোকালয়ে এসে পদ্ম খাবে? পদ্ম কেউ খায়? পদ্ম চিরকাল অখাদ্য! হরিণকে আসলে আনা হচ্ছে!

আর দিব না। মহাকবি পুরন্দর পদাঞ্জলী লিখিয়া হোয়াটস অ্যাপাইছে। পড়ুন।

পদাঞ্জলী

১) ডুয়ার্সে সরগোল দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ।
গুণীজন করিতেছে ফুল তোলা ব্যাক।।

২) কোচদেশে আশ্বাস দিলা প্রামাণিক।
উড়িবে-নামিবে প্লেন এইবার ঠিক।।

৩) সাইবেরি' হতে আসি পাখিদের দল।
তুফানগঞ্জে করে কল-কল-কল।।

৪) স্বীকার করিছে ইহা সব পক্ষ রে।
আলিপুর খায় খাবি মধু চক্করে।।

কলম সিং

কড়া কীটনাশকেও মরছে না উত্তরের মশা

চা বাগান এলাকায় মারণ রোগের আশংকা ?

গৌতম চক্রবর্তী

উত্তরবঙ্গে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, লিম্ফাটিক ফাইলারিয়াসিস, জাপানি এনসেফ্যালাইটিস, চিকনগুনিয়া ইত্যাদি অনেক ভয়ংকর গ্রীষ্মকালীন রোগের জন্য মশককুল দায়ী। কিন্তু দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং উত্তর দিনাজপুর জেলা থেকে মশার নমুনা সংগ্রহ করে দেখা গেছে তাদের মধ্যে অর্গানোফসফেট, কার্বামেট, সিন্থেটিক পাইরেথ্রয়েড এবং ডিডিটির মত কীটনাশকগুলিকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা গড়ে উঠেছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের গবেষক অধ্যাপক ধীরাজ সাহার নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক ডুয়ার্সের চা বাগান অধ্যুষিত অঞ্চল সহ বিভিন্ন অঞ্চলে নিরন্তর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে আবিস্কার করেছেন এই ভয়াবহ তথ্য। তবে কি চা বাগান জুড়ে ফের শুরু হতে পারে মশাবাহিত মহামারী ?

বিশ্বের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং উপক্রান্তীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা দ্রুততম বাহক সংক্রামক রোগগুলির মধ্যে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ রোগ ডেঙ্গু। প্রধানত ক্রান্তীয় এবং উপক্রান্তীয় দেশগুলিতে যথাযথ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব এবং অনুকূল জলবায়ুর কারণে বিভিন্ন সংক্রামক রোগ দেখা যায়। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড়ের বিস্তার কৃষিক্ষেত্র বা বাগিচাক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, লিম্ফাটিক ফাইলারিয়াসিস, জাপানি এনসেফেলাইটিস, চিকনগুনিয়ার মত ভয়ংকর গ্রীষ্মকালীন রোগের জন্য মশককুল দায়ী। উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতার কারণে এবং দেশের কিছু অংশে সঠিক স্বাস্থ্যবিধির অভাবের কারণে ভারতবর্ষ মশাবাহিত এই পাঁচটি রোগের তীর্থক্ষেত্র। সঠিক চিকিৎসার অভাবে এই রোগগুলির মধ্যে কয়েকটি মারাত্মক হতে পারে এবং রোগী দীর্ঘকালীন অক্ষমতা এবং দুর্বলতার শিকার হতে পারে। বিশ্বব্যাপী কয়েক লক্ষ মৃত্যুর ঘটনা ইতিমধ্যেই ঘটেছে। লিম্ফাটিক ফাইলারিয়াসিস কুড়িটি রাজ্যের এবং পাঁচটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে প্রায় ৬০০ মিলিয়ন মানুষের মধ্যে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। মানুষের স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থাও প্রভাবিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। নির্দিষ্ট ওষুধ এবং ভ্যাকসিনের অভাবে রোগ প্রতিরোধের একমাত্র পদ্ধতি হিসাবে প্রধানত কীটনাশক ব্যবহার করে ভেক্টর নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্ভর করতে হয়। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের গবেষক অধ্যাপক ধীরাজ সাহা এবং তাঁর ছাত্ররা ২০১৮ সালের এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এই তিনটি জেলার আটটি জনবহুল এলাকা থেকে কিউলেক্স মশার নমুনা সংগ্রহ করেন। ডক্টর ধীরাজ সাহা বলেন, যে ধরনের প্রতিরোধ ক্ষমতা মশার মধ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাতে এটা বোঝা যাচ্ছে যে মশার বংশবৃদ্ধি রুখতে আমরা যে কৌশল অবলম্বন করছি তা আর বেশিদিন কাজে লাগবে না। যে ধরনের প্রতিরোধ ক্ষমতা মশার মধ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাতেই এটা পরিষ্কার। উত্তরবঙ্গের অন্তত তিনটি জেলায় ফাইলেরিয়ার মত রোগ ছড়ানো মশাদের মধ্যে কীটনাশক

উপরে কিউলেক্স নিচে এডিস মশা

প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠেছে। তিনি বলেন, এই কীটনাশকগুলো হয়ত কিছু কিছু এলাকায় কাজে দেবে। তবে এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত বিকল্প কিছু ভাবতে হবে। প্রয়োজনে এলাকাভিত্তিক আলাদা আলাদা কৌশল অবলম্বন করতে হবে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা এ ব্যাপারে আরও সচেতনতা বাড়াবার কথা বলেছেন।

ভারত একটি উন্নয়নশীল দেশ বলে এই সমস্যাগুলি সমাধানের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও পিছিয়ে আছে। লিম্ফাটিক ফাইলারিয়াসিস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপেক্ষিত ক্রান্তীয় রোগগুলির তালিকায় রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার পরেই সংক্রমণ এবং সংক্রমণের তীব্রতায় ভারত দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। যদিও একটি রোগের তীব্রতা রোগের প্রকারের উপর নির্ভর করে এবং যদি রোগের বিস্তার এবং তীব্রতা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয় সেগুলি কার্যকর হয় তাহলে বিশ্বজুড়ে মানব কল্যাণের পক্ষে তা সহায়ক হয়। যদিও অনেক প্রতিরোধাত্মক কৌশল রয়েছে যা মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, সেক্ষেত্রে মশার ঘনত্বকে হ্রাস করার একমাত্র কার্যকরী উপায় হল সিন্থেটিক রাসায়নিক কীটনাশকগুলির প্রয়োগ। অতএব বাহকগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাসায়নিক কীটনাশকগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। যদিও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লিম্ফাটিক ফাইলারিয়াসিস নির্মূল করার জন্য কেমোথেরাপির প্রোগ্রাম রয়েছে, তবুও কীটনাশক প্রয়োগের মাধ্যমে ভেক্টরের নিয়ন্ত্রণ এখনও বিশ্বব্যাপী ফাইলারিয়া নিয়ন্ত্রণের অধিক প্রচলিত কৌশল। নির্দিষ্ট ওষুধ এবং ভ্যাকসিনের অভাবে রোগ প্রতিরোধের একমাত্র পদ্ধতি হিসাবে প্রধানত কীটনাশক ব্যবহার করে ভেক্টর নিয়ন্ত্রণের ওপর নির্ভর করতে হয়। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক নিয়মিতভাবে কিউলেক্স মশার বংশবৃদ্ধি রোধে বিভিন্ন প্রকল্পের পাশাপাশি ফাইলেরিয়া আক্রান্ত রোগীদের জন্য নানা ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করে। তা সত্ত্বেও এই মশাকে পুরোপুরিভাবে নির্মূল করার লক্ষ্য এখনও পূরণ করা যায় নি।

এবারের উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলার ৮টি এলাকা থেকে সংগৃহীত মশার নমুনা পরীক্ষা করে গবেষকরা জানাচ্ছেন, প্রশাসনের তরফে মশা মারতে যেসব কীটনাশক ব্যবহার করা হয়, সংশ্লিষ্ট এলাকার কিউলেক্স মশার মধ্যে সেগুলির প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠেছে। তাঁরা জানান, জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি এবং ফুলবাড়ি এবং শিলিগুড়ি, বিধাননগর এলাকা থেকে সংগৃহীত কিউলেক্স মশার উপর কীটনাশক প্রয়োগ করে দেখা গেছে এটা ৬০ শতাংশেরও কম কিউলেক্স মশা মারতে পারছে। অন্যদিকে যে মশার মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে নি সেখানে এই কীটনাশক ১০০ শতাংশ সফল হচ্ছে। গবেষকরা বলছেন প্রতিরোধের বিষয়টি প্রধান উদ্বেগের কারণ। কারণ মশা তাড়াতে এই কীটনাশকগুলি সাধারণ মানুষ বাড়িতে ব্যবহার করে। মশা তাড়ানোর বিভিন্ন ধূপ এবং তেলের মধ্যে এই কীটনাশক থাকে। কিন্তু মশা বেমালুম এই কীটনাশকগুলিকে হজম করে নিচ্ছে। ডক্টর ধীরাজ সাহা

বলেন, মশককুলকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার যেসব বিধি-বিধান গ্রহণ করে বা কৌশল নেয় সেগুলি খুব একটা বেশি সময় ধরে কাজ করবে না। কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে বিকল্প এবং এলাকা নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ কৌশলগুলি তৈরি করতে হবে। তাঁদের এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে পিএলওএস ওয়ান (পাবলিক লাইব্রেরি অব সায়েন্স) জার্নালে। অন্যদিকে কেন্দ্রের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় পর্যায়ক্রমে রোগনির্ণয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত রোগীদের চিহ্নিত করে ফাইলারিয়া নির্মূল করার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে।

চার ধরনের কীটনাশক অর্গানোফসফেটস, কার্বামেটস, সিনথেটিক পাইরেথ্রয়েড এবং ডিডিটি মশককুল সহ কীটপতঙ্গের সংক্রমণকে প্রতিরোধ করে। সাম্প্রতিককালে গবেষকেরা উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলার আরও আটটি স্থান থেকে সিন্থেটিক পাইরেথ্রয়েড প্রতিরোধী মশার নমুনা খুঁজে পেয়েছেন যারা রীতিমত পারমেথ্রিন, ডেল্টামেথ্রিন এবং ল্যাম্বডা সাইহালোথ্রিন নামক কীটনাশক হজম করে ফেলছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন পাইরেথ্রয়েড প্রতিরোধের খবর একটি অন্যতম প্রধান উদ্বেগের বিষয় এই জন্যই যে এই কীটনাশকগুলি অত্যন্ত কড়া ক্ষমতাসম্পন্ন কীটনাশক। এগুলি ব্যবহৃত হয় অপারেশন থিয়েটারগুলিতেও। এগুলির প্রতিরোধাত্মক শক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া মানে খুবই উদ্বেগের বিষয়। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা এডিস মশার দ্বারা আক্রান্ত জনসংখ্যা নিয়েও গবেষণা করেছেন এবং কীটনাশকগুলি কীভাবে মশারা প্রতিরোধ করছে তার বিভিন্ন মাত্রা দেখিয়েছেন। তারা দেখেছেন মশার নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর এর দ্বারা ব্যবহৃত পাইরেথ্রয়েড পার্মেথ্রিন নামে পরিচিত কীটনাশক মাত্র ৬০ শতাংশ মশককুলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে। বাকি মশারা বেমালুম এই কীটনাশক হজম করে ফেলছে। আলিপুরদুয়ার, কুচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং উত্তর দিনাজপুরের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে গবেষণা চালিয়ে গবেষকেরা এডিস ইজিপটাই মশা দ্বারা আক্রান্ত জনসংখ্যার বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করেন এবং সেই সমস্ত মশার স্যাম্পল সংগ্রহ করে গবেষণাগারে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। তাঁদের মতে, এই ধরনের মশা ডেঙ্গু ছড়িয়ে দেয় এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধের জন্য এই ধরনের মশা নিয়ন্ত্রণে যে রাসায়নিক ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে কাজ হচ্ছে অনেকটাই কম। অবিলম্বে বিকল্প কিছু একটা ভাবা প্রয়োজন।

গবেষকদের মতে আলিপুরদুয়ার জেলায় ১১ শতাংশ, জলপাইগুড়ি জেলায় ৯ শতাংশ, উত্তর দিনাজপুর জেলায় ১০ শতাংশ ক্ষেত্রে পাইরেথ্রয়েড কীটনাশক সাফল্যজনকভাবে কাজ করতে পেরেছে। বাদবাকি সব ক্ষেত্রেই কোনও কাজ হয়নি। ডেলটামেথ্রিন এবং ল্যাম্বডা সাইহালোথ্রিন নামক মশা প্রতিরোধক কীটনাশক স্প্রে করেও কাজের কাজ কোনও কিছু হচ্ছে না। মশাদের প্রতিরোধাত্মক শক্তি সাংঘাতিক রকমের বেড়ে গেছে। ধীরাজ সাহার মতে, ডেলটামেথ্রিন এবং ল্যাম্বডা সাইহালোথ্রিন প্রতিরোধের এটাই প্রথম রিপোর্ট। এই রিপোর্ট এমন অঞ্চল থেকে এসেছে যেখানে স্থায়ীভাবে ডেঙ্গু সনাক্তকরণ হয়েছে চা বাগানের বস্তি অঞ্চলে। যদি এই প্রবণতা অব্যাহত থাকে তাহলে এই অঞ্চলে মশককুল প্রতিরোধাত্মক কর্মসূচি যে বিঘ্নিত হবে তাতে কোনও সন্দেহই নেই। উত্তরবঙ্গের গবেষকেরা তাদের এই গবেষণাপত্রের নির্দিষ্ট অংশ প্রকাশ করেছেন যা ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলে দিয়েছে। তারা তাঁদের গবেষণায় পাঁচটি জেলার বন্য মশার জনসংখ্যার এর নমুনা এবং

ধীরাজ সাহা (বসে) ও তাঁর গবেষকদল

ডেলটামেথ্রিন এবং ল্যাম্বডা সাইহালোথ্রিন প্রতিরোধের এটাই প্রথম রিপোর্ট। এই রিপোর্ট এমন অঞ্চল থেকে এসেছে যেখানে স্থায়ীভাবে ডেঙ্গু সনাক্তকরণ হয়েছে চা বাগানের বস্তি অঞ্চলে। যদি এই প্রবণতা অব্যাহত থাকে তাহলে এই অঞ্চলে মশককুল প্রতিরোধাত্মক কর্মসূচি যে বিঘ্নিত হবে তাতে কোনও সন্দেহই নেই। উত্তরবঙ্গের গবেষকেরা তাদের এই গবেষণাপত্রের নির্দিষ্ট অংশ প্রকাশ করেছেন যা ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলে দিয়েছে।

বিভিন্ন কীটনাশকগুলির সুপারিশকৃত সংশ্লেষণের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করার উপর ভিত্তি করে তাঁদের গবেষণার কাজ চালিয়ে যান। উত্তর দিনাজপুরের বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্ককে টেম্পোফোর নামে একটি কীটনাশকের প্রতিরোধী বলে মনে করেন, যেটি ভারতে ভেক্টর বহিরাগত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে সর্বাধিক ব্যবহৃত লার্ভিসাইড। টেম্পোফোর প্রতিরোধের বিকাশে ডেঙ্গু প্রতিরোধের প্রচেষ্টার গুরুতর প্রভাব রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা তাদের মতামত লিখেছেন প্লস ওয়ান সায়েন্টিফিক জার্নালে। এর মানে অন্যান্য পাইরেথ্রয়েডের প্রতিরোধের মাত্রা ভবিষ্যতে বাড়াতে হতে পারে।

উত্তরবঙ্গের এই মশককুলের পাইরেথ্রয়েড প্রতিরোধের এই চিত্র উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে তুলেছে কারণ তিন বছর আগে নতুন দিল্লির জাতীয় ম্যালেরিয়া গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা এডিস অ্যালবোপিকটাস নামে ডেঙ্গু পরিবাহী মশার ডেলটামেথ্রিন প্রতিরোধের মাত্রা পরীক্ষা করে দেখেছেন, দিল্লিতে ৯৭ শতাংশ মশার মৃত্যু হচ্ছে এবং কেরালা ও উত্তরাখণ্ডে ১০০ শতাংশ মশা মৃত্যুবরণ করছে। অথচ উত্তরবঙ্গের এই পাঁচটি জেলায় কী এমন ঘটনা ঘটল যে মশককুলের প্রতিরোধাত্মক শক্তি বৃদ্ধি পেল? দার্জিলিংয়ের চা বাগানে মূলত জৈব সার ব্যবহার করা হয় এবং সিন্থেটিক কীটনাশক দার্জিলিং এর বাগানগুলি ব্যবহার করে না। কিন্তু ডুয়ার্সের চা বাগানগুলিতে নিয়মিত সিনথেটিক কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। অর্গানোক্লোরিন, অর্গানোফসফরাস, নিওনিকোটিনয়েড ইত্যাদি ১১টি কীটনাশক ব্যবহার করা হয় ডুয়ার্সের বাগিচা ক্ষেত্রগুলিতে। কালচিনি চা বাগান থেকে চা-মশা হেলোপেলিটিস থিওভোরা ওয়াটারহাউস-এর নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন গবেষক দল, যা থেকে পরিস্কার চা বাগানের মশাদের সব এখন কীটনাশক হজম করে ফেলছে। ডক্টর ধীরাজ সাহার নেতৃত্বে গবেষকদের মতে, কীটনাশক প্রতিরোধের সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী ভেক্টর নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিও ব্যর্থতার সম্মুখীন হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের সাব-হিমালয়ান অঞ্চলে অ্যালবোপিকটাস মশার ডিডিটি, পার্মেথ্রিন এবং প্রোপক্সারের কীটনাশক প্রতিরোধের বর্তমান অবস্থা জানতে তদন্ত করা হয়েছিল। এছাড়াও এই তিনটি কীটনাশক হজমকারী এনজাইমের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য পরিমাণগত এবং গুণগত ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তদন্ত করা হয়েছিল। জানা গেছে সেখানে ৪ শতাংশ, আলিপুরদুয়ারে এবং জলপাইগুড়িতে যে স্যাম্পল সার্ভে হয়েছিল তাতে দেখা গেছে সেখানে ১ শতাংশেরও কম এবং জলপাইগুড়িতে ১ শতাংশেরও কম মশার ক্ষেত্রে এই কীটনাশকগুলি কাজ করছে। চা চাষে এই সিন্থেটিক কীটনাশকগুলির ব্যাপক এবং নিয়ন্ত্রণহীন মাত্রায় ব্যবহারের কারণেই মশার ভেক্টরগুলিতে কীটনাশক প্রতিরোধের মাত্রাবৃদ্ধি ঘটছে। এই অঞ্চলের ভেক্টর বাহিত রোগের নিয়ন্ত্রণে নতুন কৌশল ভীষণ প্রয়োজন। সেই কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময় প্রতিরোধের সর্বশেষ পরিমাণ জরিপের জন্য বর্তমান গবেষণা প্রচুর সাহায্য করবে বলে আশাবাদী উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদল।

নির্বাচন রাজনীতির পাচন

বঙ্গ বিজেপি এখনও গ্যাস বেলুন! তবু মানুষের কাছে মাথা নত করবেন না?

জয়ন্ত গুহ

ভোটের আগে পারস্পরিক হুঙ্কার-হুঁশিয়ারি সেই কবে শেষ হয়ে গেছে। ভোটের ফলাফল বেরিয়ে গেল। মুখ থুবড়ে পড়ল সেই ক্রমাগত হুঙ্কার, "বাংলায় বিজেপি একটাও আসন পাবে না এবং গোটা দেশে বিজেপি একশোটা আসনও পায় কিনা সন্দেহ!" নির্বাচন শেষে দেশ ও রাজ্য প্রমাণ করে দিয়েছে, তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব। ফেডারেল ফ্রন্টের যে নেতারা তাঁকে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তুলে ধরেছিলেন, তাঁরা আজ কোথায়? নিজের রাজ্য চালাতে যাকে হিমসিম খেতে হচ্ছে, মাটি হারিয়ে যিনি প্রায় গৃহবন্দী কলকাতায় —তাঁকে কল্পনা করা হচ্ছিল দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে? এবং অবাস্তব এই তত্ত্বে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি! ২০০৯-র লোকসভা নির্বাচনে তিনি এইরকম অবিশ্বাস্যভাবে ১৯টি আসন জেতার পরও, বামেদের প্রবল প্রতিরোধ ও লড়াই গড়িয়েছিল ২০১১র বিধানসভা নির্বাচন অবধি। কিন্তু ক্ষমতালোভী ঘাসফুল বাহিনী যে হারে ঝাঁকে ঝাঁকে বিজেপিতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তাতে অনিবার্য একটি প্রশ্ন, ২০২১ অবধি এই সরকার থাকবে? নাকি হাত মেলাতে বাধ্য হবেন বিজেপির মোদী-শাহ ঘরানার সঙ্গে? এই 'অবিশ্বাস্য কল্পকথা' সত্যি হলে মেলবন্ধনের ভূমিকায় থাকতে পারেন —প্রশান্ত কিশোর। শিবসেনার সঙ্গে মোদী-শাহ ঘরানার অস্বস্তি তো তিনিই মিটিয়েছিলেন।

পুর্ব ঘোষণা অনুযায়ী মমতা জেলায় জেলায় বৈঠক করতে যেতে পারছেন না। যদিও বা গেছেন, তাঁকে দেখেই 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিচ্ছে বিজেপি। উস্কানির ফাঁদে পরে তিনি প্রবল রেগে গেছেন এবং সেটাই খবর হয়েছে। প্রবল ক্রোধ তাঁর 'রাজনৈতিক অ্যাসেট'। কিন্তু তাতে কাজ দিচ্ছে না। ডাক্তারদের ধর্মঘট নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়েও তিনি মাথা গরম করে ফেলেছিলেন। ৪৮ ঘণ্টার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। পরে বেগতিক দেখে নমনীয় হন এবং ডাক্তারদের ডেকে বৈঠক করেন।

২ থেকে ১৮ হবার পর বিজেপি প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সরকারবিরোধী বিক্ষোভে নামছে। অস্বস্তিতে রাখছে সরকারকে। কিন্তু পুর্ব ঘোষণা অনুযায়ী মমতা জেলায় জেলায় বৈঠক করতে যেতে পারছেন না। যদিও বা গেছেন, তাঁকে দেখেই 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিচ্ছে বিজেপি। উস্কানির ফাঁদে পরে তিনি প্রবল রেগে গেছেন এবং সেটাই খবর হয়েছে। প্রবল ক্রোধ তাঁর 'রাজনৈতিক অ্যাসেট'। কিন্তু তাতে কাজ দিচ্ছে না। ডাক্তারদের ধর্মঘট নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়েও তিনি মাথা গরম করে ফেলেছিলেন। ৪৮ ঘণ্টার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। পরে বেগতিক দেখে নমনীয় হন এবং ডাক্তারদের ডেকে বৈঠক করেন। তাতে যে ভেঙ্গে পড়া স্বাস্থ্যব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল তা নয় কিন্তু আবারও প্রমাণিত হল, তাঁর হুঙ্কার আগের মত আর গুরুত্ব পাচ্ছে না। এবং তিনি রাজনৈতিক হয়ে উঠতে পারছেন না। আরও অবাক কাণ্ড, নির্বাচনের পর তিনি উত্তরবঙ্গে একবারও পা রাখেন নি। হয়ত রাখতে পারছেন না। যিনি কথায় কথায় উত্তরবঙ্গ সফর করতেন এবং মঞ্চের ওপর পায়চারি করতে করতে, প্রশাসক এবং তাঁর দলের নেতাদের ধমক বা পরামর্শ দিয়ে, মুহূর্তে মুহূর্তে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন করে দিতেন, সেই উত্তরবঙ্গ এবং পাহাড়ে তাঁর দলকে মানুষ কার্যত ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

অবস্থা এতটাই ঘোরালো যে ডুয়ার্সের মাটিতে পা রাখার জন্য যখন তিনি কোচবিহারে সিনিয়র নেতাদের পাঠিয়ে চিড়ে ভেজাতে চাইছেন, তখন দক্ষিণ দিনাজপুরের তৃণমূল জেলা পরিষদের দখল নিচ্ছে বিজেপি। জেলার বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা-সংগঠক বিপ্লব মিত্রও দল ছেড়ে যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। তৃণমূলের ১০জন নির্বাচিত সদস্য এবং বিপ্লব মিত্র, দলত্যাগ করার মূল কারণ অর্পিতা ঘোষ। অর্পিতাকে বালুরঘাটে

লোকসভা প্রার্থী করা নিয়ে বিরোধিতা করেছিলেন জেলা সভাপতি বিপ্লব মিত্র। অর্পিতা লোকসভায় হেরে যান। কিন্তু তাঁকেই পরবর্তীকালে জেলা সভাপতি করা হয়। নির্বাচনে প্রার্থী এবং জেলা সভাপতিত্ব —দুটি সিদ্ধান্তই মমতার।

দলত্যাগীদের বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারিকে তোয়াক্কা না করে, বিপ্লব মিত্রদের সঙ্গে একই দিনে আলিপুরদুয়ারের কালচিনি বিধানসভার বিধায়ক উইলসন চম্প্রামারি-ও যোগ দেন বিজেপিতে। কেন যোগ দিলেন বিজেপিতে? উইলসনের অভিযোগ, তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রে কী এবং কীভাবে উন্নয়ন হবে সেটা কলকাতায় তৃণমূল নেতারা ঠিক করেন। এ অভিযোগ কিন্তু নতুন নয়। একসময় উইলসনের মত প্রায় একই অভিযোগ তুলে বিদ্রোহী হয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ কবীর সুমন। উইলসনের কথা সত্যি হলে, মূলত অভিযোগের আঙ্গুল উঠছে অরূপ বিশ্বাসের দিকে। উত্তরবঙ্গের মানচিত্র গেরুয়া হয়ে যাওয়ার আগে ও পরে অরূপ বিশ্বাসেই মমতার বিশ্বাস। সুতরাং লোকসভা নির্বাচনের আগে ও পরে, উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের হাল ধরার লোকের অভাব ছিল না। অভাব ছিল মমতার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং তাঁর নিজেকে নিয়ে নিজের ভুল মুল্যায়ন। 'তৃণমূলে একটাই পোস্ট — বাকী সব ল্যাম্পপোস্ট'-র দর্শন মানুষের কাছে পুরনো হয়ে গেছে। মাটির সঙ্গে যোগাযোগ না থাকা, ধামাধরা কলকাতার নেতাদের দিয়ে উত্তরবঙ্গ ও পাহাড়ের মাটি ভিজবে না। আবার দুর্বিনীত, রাজনৈতিক পাঠে শূন্যগর্ভ এবং মানসিকভাবে ক্রাইম-মনস্ক উত্তরের সেই সব নেতাদের মাথায় দিনের পর দিন মমতাময় আশীর্বাদের দায়ও তো আপনাকেই নিতে হবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

সদ্য নির্বাচন শেষে দেশ জুড়ে মোদি-ঝড় সত্ত্বেও প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশায় নবীন পট্টনায়েকের বিজেডি লোকসভায় ১২-৮ এবং বিধানসভায় ১১২-২৩ ব্যবধানে বিজেপির থেকে এগিয়ে। তারপরেও আমরা কখন কি শুনেছি, নির্বাচন শেষে নবীন পট্টনায়েক তাঁর রাজ্যের স্বার্থ থেকে মুখ ঘুরিয়ে, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া বিজেপির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন! এটা মমতা ব্যানার্জির পক্ষেই সম্ভব। কাটমানি বিপ্লব ঘোষণা করে, উত্তর থেকে দক্ষিণে বিজেপির হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার পর তিনি যখন তাঁর নিজের দল ও রাজ্যও নিয়ে জেরবার হচ্ছেন, তখন বিজেপির বিরুদ্ধে আগামী লড়াইয়ে তিনি পাশে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন, কংগ্রেস ও সিপিএমকে। অথচ কিছুদিন আগেই লোকসভা নির্বাচনের প্রচার চলাকালীন বলেছিলেন, মালদা-মুর্শিদাবাদে আরএসএস-কংগ্রেস আঁতাত হয়েছে। এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কাকদ্বীপে সস্ত্রীক

একেবারে ডুবে যাওয়ার আগে তিনি বিধানসভা ও ট্যুইটে হুঙ্কার ছাড়ছেন। প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এমন একটাও পলিসি ঘোষণা করতে পারেননি যাতে গা ঝাড়া দিয়ে ঘুরে দাঁড়াবে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। তিনি একবারের জন্যও উত্তরবঙ্গ বা জঙ্গলমহলে গিয়ে মানুষের মুখোমুখি হয়ে বলতে পারেন নি, আপনাদের রায় আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। অবশ্য এমনটাই বলতে হবে তাঁর কোনও মানে নেই। কিন্তু পরাজয় স্বীকার করুন। রাজ্যের স্বার্থে দিনরাত মোদী বিরোধিতা বন্ধ করে রাজ্যের উন্নয়নে মন দিন। এখনও সুযোগ আছে আপনার, কেন না উল্টোদিকে রাজ্য বিজেপি আসলে একটি গ্যাস বেলুন। মানুষ আপনার বিরুদ্ধে বিরক্ত হয়ে মোদী-শাহকে ভোট দিয়েছে। যার কোনও ক্রেডিট রাজ্য বিজেপির কোনও নেতার নেই। বিজেপির এখনও কোনও মুখ্যমন্ত্রীর মুখ নেই।

সিপিএম দম্পতিকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। সিপিএম-র অভিযোগের আঙ্গুল ছিল তৃণমূলের দিকে। অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল।

২০১১-র পর থেকে রাজ্যে আরএসএস-র বিপুল বৃদ্ধি তাঁরই কল্যাণে। তখন তিনি ছিলেন বিজেপির কাছের লোক। তারপর তাঁর সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতি এবং সিপিএম-কংগ্রেসকে সাইনবোর্ড করে দিয়ে এ রাজ্যে বিজেপির প্রবেশের রাস্তা তিনিই খুলে দিয়েছিলেন। সিপিএম-কংগ্রেসকে ধুলোয় মিশিয়ে তিনি গোটা রাজ্য তৃণমূলময় না করে তুললে, অস্তিত্বের স্বার্থেই সিপিএম-কংগ্রেস প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠতে পারত বিজেপির বিরুদ্ধে।

একেবারে ডুবে যাওয়ার আগে তিনি বিধানসভা ও ট্যুইটে হুঙ্কার ছাড়ছেন। প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এমন একটাও পলিসি ঘোষণা করতে পারেননি যাতে গা ঝাড়া দিয়ে ঘুরে দাঁড়াবে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। তিনি একবারের জন্যও উত্তরবঙ্গ বা জঙ্গলমহলে গিয়ে মানুষের মুখোমুখি হয়ে বলতে পারেন নি, আপনাদের রায় আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। আমাদের ভুল স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু গণতন্ত্রের একজন সেবক হিসাবে আমি আপনাদের পাশে থাকতে চাই...।

অবশ্য এমনটাই বলতে হবে তাঁর কোনও মানে নেই। কিন্তু পরাজয় স্বীকার করুন। রাজ্যের স্বার্থে দিনরাত মোদী বিরোধিতা বন্ধ করে রাজ্যের উন্নয়নে মন দিন। এখনও সুযোগ আছে আপনার, কেন না উল্টোদিকে রাজ্য বিজেপি আসলে একটি গ্যাস বেলুন। মানুষ আপনার বিরুদ্ধে বিরক্ত হয়ে মোদী-শাহকে ভোট দিয়েছে। যার কোনও ক্রেডিট রাজ্য বিজেপির কোনও নেতার নেই। বিজেপির এখনও কোনও মুখ্যমন্ত্রীর মুখ নেই। এতটাই খারাপ অবস্থা যে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা, আসলে মধ্যপ্রদেশের এক অচল নেতা। এতটাই অচল যে তাঁকে মধ্যপ্রদেশ থেকে বার করে দিতে হয়েছে। তাঁকে বা মুকুল রায়কে দেখে মানুষ কি বিজেপিকে বিধানসভায় ভোট দেবে? একথাটা মুকুল কৈলাশরা-ও জানেন। ১৮টি আসন রাজ্যের মানুষ বিজেপিকে উপহার দেবার পর— সর্বত্র মানুষ যখন বিজেপির রাজনৈতিক ন্যারেটিভ শুনতে চাইছে, লোকসভায় নরেন্দ্র মোদীর প্রথম ভাষণে সবাই যখন অভিভূত, তখন এ রাজ্যে বিজেপির পক্ষে কৈলাশের ন্যারেটিভ হল, "সাত দফায় তৃণমূল থেকে দলত্যাগ করানোর কর্মসূচী আছে আমাদের। এখনও প্রথম দফা শেষ হয়নি"। আর মুকুলের ন্যারেটিভ? "সাত দফা শেষ হলে দেখবেন সরকার বদলে গেছে"। ভবিষ্যতের এই তৃণমূলময় সম্ভাব্য বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছে বাংলায় আরএসএস-র মুখপত্র 'স্বস্তিকা'। ব্যাল্যান্স রেখে ব্যাট করে যাচ্ছেন আরএসএস ঘেঁষা দিলীপ ঘোষ। দলভাঙ্গানো ছাড়া বিজেপির কোনও রাজনৈতিক ন্যারেটিভ নেই। সঙ্ঘাত শুরু হয়েছে বিজেপি আরএসএস-এর।

এই দুর্বল সময়ের চান্স নিয়ে মমতা মাথা নত করে, হাত জোড় করে মানুষের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেন। বলা যায় না, পাশা উল্টে গেলেও যেতে পারে। তবে তাঁর আগে মমতাকে অতিক্রম করতে হবে, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনা এবং আত্ম-অহঙ্কারের সাত সমুদ্র তের নদী। এবং এটা করার জন্য কোনও প্রশান্ত কিশোরের দরকার নেই।

উত্তরে সেদিনের **সেনাপতিরা**

দেবব্রত চাকী

কোচবিহারে জনসমক্ষে প্রথম লাল ঝাণ্ডা উত্তোলন করেন জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী !

আপাদমস্তক কমিউনিস্ট জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী। রাজনৈতিক জীবনে বহু যুদ্ধের সৈনিক এই মানুষটির চলার পথ কিন্তু মসৃণ ছিল না। বহুবার রাজনৈতিক কারণেই তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। যদিও স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে তাঁর কোনও মূল্যায়ন হয়নি। ইন্দিরা গান্ধী ও অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে পেনশনের জন্য আবেদন করেও তিনি পেনশন লাভে সমর্থ হন নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী হিসেবে প্রাপ্ত ১২০০ টাকা পেনশন ছিল তাঁর শেষ জীবনের সম্বল।

বয়স সবে মাত্র একুশ, অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ভবানী সেনের হাতে আবেদনপত্র জমা দিয়ে দলে নাম লেখালেন কুড়িগ্রামের কাঁঠালবাড়ির এক যুবক। লক্ষ্য কমিউনিস্ট পার্টির একজন সৈনিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে প্রেরণা তাঁর একজন সতীর্থ কমরেড জীবন দে। কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগদানের মধ্যে দিয়ে কুঁড়িগ্রামের জগদীশ চন্দ্র চক্রবর্তী ও কুসুমলতা দেবীর পুত্র ধীরে ধীরে পরিচয় লাভ করলেন কমরেড জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী নামে। শুরু হল রাজনীতিকে সঙ্গী করে পথ চলা, সেটি ১৯৪৩ সাল। যদিও স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে রাজনীতির আস্বাদন লাভ আরও এক বছর পূর্বে, ১৯৪২ সালে। তখন তিনি কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র। মামা বাড়িতে থেকে সুইডিশ মিশন স্কুলে পঠনপাঠন শেষ করে সবে কলেজে পা রেখেছেন। গরমের ছুটিতে গেছেন পৈতৃক ভিটা কুড়িগ্রামে। তখন দেশ জুড়ে চলছে গান্ধীজির নেতৃত্বে ভারতছাড়ো আন্দোলন। গান্ধীজির আহ্বান তাঁকেও উদ্বেল করে তোলে। তিনিও ঝাঁপিয়ে পড়েন ভারত ছাড়ো আন্দোলনে। সেই সময়কালে তাঁর সঙ্গী ছিলেন অপর কমিউনিস্ট বীরেন দে সরকার। 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' শ্লোগানে উদ্দীপ্ত যুবসমাজ তখন রাজপথে। সকলের রক্ত যেন টগবগ করে ফুটছে। জ্যোতির্ময়ও তার ব্যতিক্রম নয়। অবিভক্ত বাংলার রংপুর জেলার বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করার সময়ই সাক্ষাৎ হয় জীবন দে-র সঙ্গে। কমিউনিস্ট পার্টি হয়ে ওঠে তাঁর চলার পথ। মানুষের স্বার্থে লড়াই করাই হল জীবনের ব্রত।

পেশায় হোমিওপ্যাথি ডাক্তার জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী একসময় কম্পাউন্ডারিও করেছেন। ১৯৪০ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি তিন বছর কবিরাজী পড়েন। তাঁর এই শিক্ষা তাঁকে আর্তের সেবায় নিমগ্ন করে তোলে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৪৩ সালে যখন দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে বাংলার চর্তুদিকে হাহাকার, খাদ্যাভাবে বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহার-অপুষ্টিতে মৃত্যুশয্যায়। সে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতি তৎকালীন প্রিমিয়ার বা প্রধানমন্ত্রী মোহম্মদ সোরাবর্দি পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে রংপুরে আসেন। এই সুযোগ সদ্ব্যবহার করতে জ্যোতির্ময় তৎপর হয়ে ওঠেন। আত্মবিশ্বাসের উপর ভর করে তিনি সেখানকার পরিস্থিতির ভয়াবহতা সাহসের সঙ্গে সোরাবর্দি সাহেবকে বর্ণনা করেন। বাংলার প্রিমিয়ার তাঁর কথা শুনে রংপুর জেলার তিস্তা ও লালমণিরহাটে দুটি লঙ্গরখানা অনুমোদন করেন। পাশাপাশি বেঙ্গল মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির তরফে ডা. বিধানচন্দ্র রায় তিস্তায় একটি হেলথ ক্যাম্প বা সেন্টার চালু করেন। জ্যোতির্ময় সেখানে কম্পাউন্ডার হিসাবে কাজে যোগ দেন। আর্তের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন।

বেশ কিছুকাল রংপুরের বিভিন্ন স্থানে অতিবাহিত করার পর জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী পুনরায় কোচবিহারে ফিরে আসেন এবং গোপনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত করে ফেলেন। যদিও তদানীন্তন দেশীয় রাজ্য কোচবিহারে রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছিল একেবারেই নিষিদ্ধ। তাই প্রকাশ্যে কোনও কিছুর সঙ্গে যুক্ত থেকে রাজনীতি করার কোনও প্রশ্ন ছিল না। তবে গোপনে মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সংগঠন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন জ্যোতির্ময়বাবু, সঙ্গী বীরেন দে সরকার, অনিল রায়, ক্ষিতীশ চক্রবর্তী, বিনয় ভৌমিক প্রমুখ। ইত্যাবসরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ইংরেজ শাসকবর্গ ভারতীয়দের হাতে ভারতের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের ইঙ্গিত দিতে শুরু করে। শুরু হয়ে যায় ইংরেজ আশ্রিত করদ মিত্র রাজ্য কোচবিহারের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিভিন্ন রকম জল্পনা। এই সময়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের ন্যায় কোচবিহারেও প্রজামণ্ডল আন্দোলন গড়ে তোলার তোড়জোড় শুরু হয়। এই লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালে কোচবিহার শহরের উপকণ্ঠে খাগড়াবাড়িতে জনৈক অজিত চক্রবর্তীর বাড়িতে এক গোপন বৈঠকে প্রজামণ্ডল সংগঠন গড়ে তুলতে উপস্থিত হন জ্যোতির্ময় চক্রবর্তীসহ দিনহাটার উকিল উমেশ মন্ডল, ক্ষিতীশ মুস্তাফী, অনিল রায়, রমেশ রায়, কামিনীকুমার ভট্টাচার্য, বীরেন দে

সরকার, দেবী নিয়োগী প্রমুখ। সভায় উমেশ মন্ডলকে সভাপতি, ক্ষিতীশ মুস্তাফী ও কামিনীকুমার ভট্টাচার্যকে সভাপতি, রমেশ রায় সম্পাদক এবং অনিল রায় সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রজামণ্ডল আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল কোচবিহার রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যাতে সংযুক্ত হয় তা সুনিশ্চিত করা। অপর দিকে সেই সময়কালে আরেকটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে, যার নাম হিতসাধনী সভা। এই সংগঠনের একটি অংশ পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তে আসামে যোগ দেবার পক্ষপাতি ছিল। এই নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। শুরু হয় প্রচার, পাল্টা প্রচার। এছাড়াও হিতসাধনী সভার অপর একটি অংশ পাকিস্তানে যোগ দেবারও পক্ষপাতি ছিল।

যাই হোক, ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে ভেটাগুড়ি ফুটবল ময়দানে প্রজামণ্ডলের প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উমেশ মণ্ডল সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় দেবী নিয়োগী, জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী প্রমুখ বক্তব্য পেশ করেন। প্রজামণ্ডলের হয়ে বানেশ্বর, দিনহাটা, খাপাইডাঙ্গা, তুফানগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে সভা করেন জ্যোতির্ময়। শুধু তাই নয় কমিউনিস্ট পার্টির কৃষক সংগঠন কৃষকসভার হয়েও তিনি সক্রিয়তা প্রদর্শন করেন। ১৯৪৮ সালে ১লা মে মাথাভাঙার ফুলবাড়িতে আধিয়ারদের নিয়ে এক বিক্ষোভে তিনি নেতৃত্ব দেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির লাল পতাকা উত্তোলন করেন। হয়ত বা এটাই দেশীয় রাজ্য কোচবিহারে প্রথম ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে দিয়ে লাল পতাকা উত্তোলন।

জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী রাজনৈতিক জীবনে সিপিআই(এম) দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলী ও পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভার রাজ্য কমিটি সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। ১৯৭৯ সালে সিপিআই(এম) ত্যাগ করে তিনি সিপিআই দলে যোগদান করেন। ১৯৮৫ সালে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন আপাদমস্তক কমিউনিস্ট জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী। রাজনৈতিক জীবনে বহু যুদ্ধের সৈনিক এই মানুষটির চলার পথ কিন্তু মসৃণ ছিল না। বহুবার রাজনৈতিক কারণেই তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। কোচবিহার রাজ্যের ভারতভুক্তির পূর্বে এক বছর তিন মাস, ১৯৫৯ সালে সিতাইতে খাদ্য আন্দোলন করতে গিয়ে এক বছর, ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বিভাজনের সময় ৩১শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৬ সালের ১৪ই মে পর্যন্ত নিরাপত্তা আইনে তাঁকে কারাবাস করতে হয়। জরুরি অবস্থার সময়ও জ্যোতির্ময়বাবু এক মাস আটক ছিলেন। অর্থাৎ রাজনৈতিক জীবনে বহু কন্টকাকীর্ণ পথ তাঁকে অতিক্রম করতে হয়। যদিও স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে তাঁর কোনও মূল্যায়ন হয়নি। ইন্দিরা গান্ধী ও অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে পেনশনের জন্য আবেদন করেও তিনি পেনশন লাভে সমর্থ হন নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী হিসেবে প্রাপ্ত ১২০০ টাকা পেনশন ছিল তাঁর শেষ জীবনের সম্বল। সঙ্গে সিতাই বন্দরে ছোট একটি ঘরে হোমিওপ্যাথি প্র্যাক্টিস। ক্রমবর্ধমান দারিদ্রের সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম করতে করতে ২০০৯ সালের ৮ই জুলাই তাঁর জীবনাবসন ঘটে। ১৯২২ সালের ২২শে আগস্ট পৃথিবীর আলো দেখা এই সংগ্রামী মানুষটির মৃত্যুর পর তাঁর দেহ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কারণ জীবৎকালে জ্যোতির্ময়বাবু মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার পত্রে সই করেছিলেন।

দীর্ঘ চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করা, জ্যোতির্ময় চক্রবর্তীর জীবন সায়াহ্নে (২০০৮) তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল, বর্তমান সময়কালের রাজনীতিকে তিনি কী চোখে দেখছেন? কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে তারপর তিনি যেটি বলতে চেয়েছিলেন তা হল, বর্তমান সময়কালের সামাজিক চিত্রটি তাঁর কাছে বড়ই হতাশাজনক। চতুর্দিকে বেকারি— কর্মের জন্য হাহাকার তাঁর কাছে যেমন পীড়াদায়ক, সেরকম নীতি-আদর্শ রহিত সমাজ জীবনে বিভ্রান্ত যুব সমাজকে দেখে তিনি ছিলেন মর্মাহত। মূল্যবোধের অবক্ষয় অবলোকন করতে করতে তাঁর অভিব্যক্তি— "নীতি-আদর্শহীন দাদা-দের দ্বারা পরিচালিত হতে হতে যুবসমাজ আজ আদর্শচ্যুত।" তাদের কাছে দাদাদের কথাই যেন শেষ কথা। সেই সঙ্গে যে আদর্শকে পাথেয় করে একদিন তিনি কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের কিংবা কমিউনিস্ট পার্টির চেহারা-চরিত্র দেখেও তিনি হয়ে পড়েছিলেন যারপরনাই হতাশ। যদিও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বামপন্থার প্রতি বিশ্বাস বা দুর্বলতা অটুট ছিল এবং মনেপ্রাণে তিনি চাইতেন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বামপন্থার বিকাশ ঘটুক। সমাজ জীবনে বামপন্থী হিসাবে তাঁর পরিচয় তাঁর কাছে ছিল শ্লাঘার। দারিদ্র্যকে বরণ করে দিন কাটালেও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আদর্শগত প্রশ্নে আপোষহীন সৈনিক ছিলেন কমরেড জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী। তাঁর প্রয়াণের দশম বর্ষে তাঁর প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা।

উত্তরে সেদিনের সেনাপতিরা

এঁরা সবাই ছিলেন গণতন্ত্রের সেনানী। মানুষের অধিকার নিয়ে এঁরা সবাই লড়েছেন, হাজার হাজার মানুষের সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, লাঠি গুলি গ্যাস কারাগার কোনও কিছুই এঁদের দমাতে পারে নি। পতাকার রং যাই থাক না কেন, পিছিয়ে থাকা উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তে বিগত শতাব্দীর নানা সময়ে এঁরা উঠে এসেছিলেন মূলত নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে, অনাড়ম্বর জীবন অনিশ্চিত থাকলেও লক্ষ্য ছিল অভিন্ন। নয়া শতাব্দীর এই নেতৃত্বহীনতার যুগে এইসব অখ্যাত বিস্মৃতপ্রায় নায়কদের কথা নতুন প্রজন্মকে জানানো আজ অতি প্রয়োজন। দিকভ্রষ্ট যে তরুণ আজ খারাপ আর খুব খারাপের মধ্যে কোনটিকে বেছে নেবে বুঝে উঠতে পারছে না, সাবেককালের এই নেতাদের জীবনকথা তাদের খানিক প্রেরণা যোগাতে পারবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। এই সংখ্যা থেকে শুরু হল সেদিনের সেই সেনাপতিদের পুনরাখ্যান। ডুয়ার্সের এক খণ্ড গর্বের ইতিহাস উঠে আসবে আগামী সংখ্যাগুলিতে।

উত্তরপক্ষ

চিরদুঃখী বিড়ি শ্রমিকের বারমাস্যা

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

ছেলেবেলায় চা-বাগানের সাপ্তাহিক হাটের এক কোণায় হাঁড়িয়ার দোকানগুলোর ওপাশে দারুণ উত্তেজক নাচগানের আসর জমত। কাঁধে একজন ঢাকনা খোলা হারমনিয়াম ঝুলিয়ে আঙুলে ঝড় তুলে বাজাত 'লেকে পহেলা পহেলা প্যার', 'কওন পরদেশী মেরা দিল লে গয়া'। ঢোলক বাজাত এক সুন্দর তরুণ। আর ছিল এক রঙিন ঘাগরা, স্বল্পবসনা 'সুন্দরী'র বাঁধভাঙা উদ্দাম নাচ। মাঝে মাঝে চোঙ্গা ফুঁকে 'বেল পাতা' বিড়ির গুণাগুণ প্রচার ও সমবেত পুরুষ মহিলাদের ধূমপানে উৎসাহ দিতে বিড়ি বিতরণ। মাঝে সামান্য বিশ্রাম ও বিড়ির মুঠো বিক্রি। তখন শিল্পীরাও বসে বিড়ি ফুকত। সেই 'সুন্দরী নারী'র নাক দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরনোটা আমার খুব দৃষ্টিকটু লাগত। যখন জানলাম সে আসলে এক নারীবেশী পুরুষ তখনও হতাশ হয়েছিলাম। ছেলেদের মেয়ে সেজে এমন নাচ পরে অনেক বার দেখেছি। তখন কোনও বিধিবব্ধ সতর্কিকরণ সিগারেট বা বিড়ির প্যাকেটের উপর লেখা থাকত না। এখন লেখা থাকছে 'ধূমপান ক্যান্সারের কারণ হতে পারে'। আজকাল জানতে ইচ্ছা করে, এতসব প্রচারের পরও ধূমপানের হিড়িক কতটা কমল? উত্তরে বিড়ি শ্রমিকেরাই বা কেমন আছে?

গিয়েছিলাম ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পেটকাটি গ্রামে। গ্রামটি ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়, ময়নাগুড়ি বাজার থেকে দেড়-দুই কিলোমিটার দূরে। বেশ শান্ত সবুজ গ্রাম। ময়নাগুড়ি-রামশাই রাস্তায় একটু এগিয়ে গেলে বাঁয়ে নদীর উপর লম্বা সরু পাকা ব্রিজ। সেটা পার হলেই এক নিঝুম পাড়া। একেবেঁকে রাস্তা গেছে পেটকাটি কালীমায়ের মন্দিরের দিকে। আমার সফর সঙ্গী একে তাকে জিজ্ঞেস করছেন এখানে কারা বিড়ি বাঁধে? উত্তর একটাই, প্রায় সব বাড়িতেই বিড়ি বাঁধে।

এক তরুণীর সাথে পথে দেখা, ব্যাগ বোঝাই বিড়ির পাতা আর ছোট স্বচ্ছ থলেতে বিড়ির মশলা নিয়ে চলেছে বাড়ির দিকে। মেয়েটির নাম লক্ষ্মী কুন্ডু দাস, বয়স ২৬, ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়াশুনা, ১৪ বছর বয়সে বিয়ে, তার এক বছর পরেই এল পুত্র সন্তান। ছেলের যখন মাত্র তিন বছর তখন মেয়েটির স্বামী মারা যান। মেয়েটি বাপের বাড়িতে আশ্রয় পায়। তার ছেলেটি স্কুলে যায়, বর্তমানে তার বয়স ১১ বছর। মেয়েটি একটি বড় বিড়ি কোম্পানির এজেন্টকে বিড়ি বেঁধে দেয়। বিড়ি সেঁকার কাজ কোম্পানির ফ্যাক্টরিতে হয়ে থাকে। সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে বিড়ি জমা দিতে

হয়। এক সপ্তাহের মজুরি বাকি থাকে, সিকিউরিটি স্বরূপ। বিড়ির পাতা বাড়ি এনে জাগ দিতে হয়, অর্থাৎ পাতা একটু স্যাঁতসেঁতে একটু নরম করে নিতে হয়। নইলে পাতায় মসলা রেখে মোচড় দিলেই পাতা ভেঙ্গে যায়। এক হাজার বিড়ির জন্য ৪০০ গ্রাম পাতা ও ৩২৫ গ্রাম তামাক মসলা, এক লেচি সুতো লাগে। এক হাজার বিড়ির জন্য মজুরি দেয় ১১০ টাকা। বাড়ির সব কাজ সামলে যতটা সময় হাতে পাওয়া যায় ততক্ষণ বিড়ি বাঁধার কাজ চলতে থাকে। কেউ দিনে হাজার-দেড় হাজার বাঁধে কেউ বা দৈনিক তিন-চারশো বিড়ি বাঁধে। খুব কম শ্রমিকই মাসে তিন হাজার টাকা বিড়ি বেঁধে রোজগার করে থাকে।

আর একজন বিড়ি শ্রমিকের নাম মামনি দত্ত। বয়স ত্রিশের কোঠায়। স্বামী স্বরূপ দত্ত ও মামনি দুজনে গভীর শ্রম দিয়েও সংসারে টানাটানি ঘোচে না। দুই কন্যা পিঠোপিঠি বড় ১১ বছর, ছোটটি ১০ বছর। দুজনেই স্কুলে যায়, অবসরে মাকে ঘরের কাজে সাহায্য করে। এলাকার ৬০-৭০ জন মহিলা বিড়ি বাঁধার কাজে যুক্ত। মামনি সপ্তাহে দু-হাজার বিড়ি বেঁধে গড়ে ২২০ টাকা আয় করে থাকেন। ওই এলাকার যে এজেন্টের কাছ থেকে কাঁচামাল পাওয়া যায় বা বিড়ি বাঁধা হলে সরবরাহ করা হয় সেই ভদ্রলোকের নাম রঞ্জন দত্ত। এই শ্রমিকরা যে ব্র্যান্ডের বিড়ি বানায় তার নাম মৃদুল বিড়ি। মালিকের নাম মৃদুল দাস। উনার বাড়িতে সংগৃহীত বিড়ি সেঁকা ও প্যাকেজিং হয়। তারপর বাজারে প্রেরণ।

বেশ কিছু মহিলা বিড়ি শ্রমিক স্বনির্ভর দলে যোগ দিয়েছেন। এমন এক বিড়ি শ্রমিকের নাম জ্যোৎস্না রায়, বয়স চল্লিশ বছর। একটিই সন্তান কন্যা। স্বামী ভ্যান চালক। উনার মহিলা স্বনির্ভর দলটির নাম 'মা শীতলা'। উনি ২০ বছর যাবৎ বিড়ি বাঁধছেন। বলছিলেন, বিড়ির ধুলোয় বুকের অসুখ হয়। শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়। মাস্ক ব্যবহার করলে ভাল হবে জেনেও কেউ সেটি ব্যবহার করেন না। সংসার সামলে জ্যোৎস্না প্রতিদিন ৫০০-৭৫০ বিড়ি বেঁধে থাকেন। গড়ে প্রতি সপ্তাহে চার হাজার বিড়ি উনি এজেন্টের ঘরে জমা করে থাকেন। স্বনির্ভর দল করার কারণে বহু শ্রমিক স্বাস্থ্য সাথী কার্ড ও সমাজ সাথী কার্ড পেয়েছেন। তবে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড নিয়ে উন্নত পরিসেবা সহজলভ্য নয় বলেও অভিযোগ পাওয়া যায়।

কিছুদিন আগে আলিপুরদুয়ারে এক শ্রমিক মেলায় আইকার্ড নামে এক সর্বভারতীয় এনজিও-র স্থানীয় ইউনিটের অফিস সেক্রেটারি শ্রীমতি বাবলি ভট্টাচার্যের সঙ্গে শতাধিক মহিলা বিড়ি শ্রমিক মেলায় এসেছিলেন। কোচবিহারে যেমন পরিচিত ব্র্যান্ডের মধ্যে ভবানী বিড়ি, শ্যামল বিড়ি, মিনিফুল বিড়ি, আলিপুরদুয়ারে তেমনই তৃপ্তি বিড়ি, অর্জুন বিড়ি বা শঙ্কর বিড়ি। শোনা যায় ভবানী বিড়ির নাকি এমন খ্যাতি ছিল একসময় যে সেই বিড়ি চোরাপথে বাংলাদেশেও বিক্রি হত। বাবলি দেবী জানিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক সুরক্ষা প্রকল্পে নানা রকম সুবিধা শ্রমিকরা পেয়ে থাকে। যেমন আবাস তৈরির জন্য তিন লক্ষ টাকা, পড়াশুনোর জন্য ছেলে মেয়েদের স্কলারশিপ, বিনে পয়সায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং ওষুধ। অবশ্য সব ছোট শহরে স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুবিধে নেই।

তবে আরও একটা সুপরামর্শ পাওয়া গেল—'প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা'-য় সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলে বছরে ১২ টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে বীমা করা যায়। দুর্ঘটনায় গ্রাহকের মৃত্যু হলে খুব সহজে ইনসিওরেন্স থেকে দু লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। সামান্য টাকায় বা টাকা না দিয়েও এই খাতা ব্যাঙ্কে খোলা যায়। তবে প্রিমিয়ামের ১২ টাকা অন্তত যেন খাতায় জমা থাকে। ১৮ থেকে ৭০ বছর বয়সী মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারে। আরও একটি ইনস্যুরেন্সের সুযোগ সেভিংস অ্যাকাউন্টে ব্যবস্থা আছে তার নাম 'প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি বীমা যোজনা' যেখানে বছরে ৩২০ টাকা প্রিমিয়াম দিলে, গ্রাহকের মৃত্যু যে ভাবেই হোক নমিনি দুই লক্ষ টাকা ইনস্যুরেন্সে কোং থেকে অবশ্যই পাবে।

বিড়ি প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার 'পতাকা' বিড়ির কথা বলতেই হবে। অনেক নামী কর্পোরেটের চাইতে অনেক বেশি আয়কর দিয়ে থাকে এরা। সারা উত্তর ভারত জুড়েই এদের ব্যবসা। কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের সাথে নিউদিল্লিতেও কোম্পানির ঝাঁ-চকচকে অফিস। কোম্পানি আইনে রেজিস্ট্রীকৃত নাম পতাকা ইন্ডাস্ট্রিস প্রাঃ লিমিটেড। সাম্রাজ্যের মালিক মঃ মুস্তাক হুসেইন এই মুহূর্তে রাজ্যের বিশিষ্ট উদ্যোগপতিদের অন্যতম।

গত দশ বছরে রাজু বিড়ি ডুয়ার্সের এক পরিচিত ব্র্যান্ড। জলপাইগুড়ির মহামায়া পাড়ায় রাজুদের বাড়ি থেকেই ব্যবসা পরিচালিত হয়ে থাকে। এই শহরে চন্দন বিড়িও বেশ ভাল বিক্রি হয়ে থাকে। রাজুর দুজন এজেন্ট আছে, তাদের ঘরে বিড়ি তৈরির সবরকম কাঁচা মাল মজুত থাকে। বিড়ি শ্রমিকরা এখান থেকেই কাঁচা মাল সংগ্রহ করে এবং এখানেই তৈরি বিড়ি জমা করে। এই এজেন্ট বা কনট্রাকটার যে শুধুমাত্র একজন মালিকের পক্ষে কাজ করেন এমনটা মোটেই নয়, বেশিরভাগ এজেন্ট একাধিক মালিকের উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

বিড়ির পাতা অর্থাৎ কেন্দু পাতার উৎপাদন ও নিলাম হয় ওড়িশায়। মহাজনরা থাকেন কলকাতা, কোচবিহার, ধুলিয়ান প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে। জলপাইগুড়ির 'চৌধুরী টোবাকো' একজন মাঝারি মাপের মহাজন। একটি ট্রাকে ১০০ বস্তা পাতা বোঝাই করা হয় যার মূল্য গুণমানের উপর নির্ভর করে ১০ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ টাকা হতে পারে। মাল কখনও নিম্নমানেরও আসতে পারে, সেটা অবশ্যই লোকসান। ৬০ কেজির একটি বস্তায় গড়ে ৫০ কেজি ব্যবহারযোগ্য পাতা পাওয়া যায়। গড়ে এক কেজি পাতার মূল্য দাড়ায় ২৫০ টাকা। (প্রতি ১০০০ বিড়িতে ৪০০ গ্রাম পাতা প্রয়োজন হয়।)

বিড়ি মসলার বা তামাকের মূল বাজার গুজরাটে। কলকাতায় আই.টি.সি. বিড়ির তামাকের বড় মহাজন। 'অগ্রিম টাকা ড্রাফটে পাঠাও ও মাল নাও' এটাই পলিসি। ৩৫ কেজির একটি বস্তার মূল্য ৫০০০ থেকে ৭০০০ টাকা। সেই হিসেবে দেখা যাচ্ছে ১০০০ বিড়ির উৎপাদন খরচ—

ক) পাতা ৪০০ গ্রাম = ১০০ টাকা
খ) তামাক ৩২৫ গ্রাম = ৭৫ টাকা
গ) সুতা = ২ টাকা
ঘ) মজুরি ও এজেন্ট বাবদ = গড় ১৪০ টাকা
ঙ) সেঁকা ও প্যাকেজিং =৮ টাকা
চ) বিবিধ = ২৫ টাকা
ছ) মার্কেটিং ও ডিলারের কমিশন = ৩০ টাকা।
মোট খরচ (১০০+৭৫+২+১৪০+৮+২৫+৩০) = ৩৮০ টাকা

বাজারে ১৬টা বিড়ির এক প্যাকেটের মূল্য ১০ টাকা। রাজু বলেছিল ১০০০ বিড়ির বিক্রয় মূল্য= ১৬৫, অর্থাৎ প্রতি হাজার বিড়িতে লোকসান ২১৫ টাকা? এ আবার কেমন ব্যবসা? কিছুতেই হিসেব মেলাতে পারছিলাম না। তখন রাজুই জানাল, বিড়ির ক্ষেত্রে ১০০০ ধরা হয় ৪০০ বিড়িকে। সেই হিসেবে দোকানদার সেই বিড়ি কেনে ৪১২.৫০ টাকায়। উৎপাদকের প্রতি হাজারে লাভ (৪১২.৫০-৩৮০)= ৩২.৫০ টাকা।

এই ব্যবসায় তাদের পরিবারের অনেক মানুষ শ্রম দিয়ে থাকেন এবং তাদের পারিশ্রমিক উৎপাদন খরচের সঙ্গে যুক্ত হয় না, সেই কারণে লাভের অঙ্কটা বেশ ভারিই মনে হয়। সেঁকার ব্যবস্থা সেই মান্ধাতা আমলেরই আছে। কয়লার উনুনে হালকা আঁচে বিড়ি সেঁকা হয়। বাড়ির লোকদের বাদ দিলেও চার পাঁচ জন মজুর প্রতিদিন কাজ করে। ঘুঁটে বা গোবর ঘসি এখানে মোটেই পাওয়া যায় না, অথচ কয়লার উনান ধরাতে ঘুঁটে লাগবেই। কাজেই কখনও বাইরে থেকে ঘুঁটে আমদানি করা হয়। কয়লা একান্ত দুষ্প্রাপ্য বস্তু, দুর্গাপুর থেকে হার্ড কোক আমদানি করা হয়ে থাকে।

রাজুদের বিড়ির ব্যবসা বংশানুক্রমিক। রাজুর দাদু কোচবিহারের রবি রায় মশায় 'মা ভবানী' বিড়ি কোম্পানিতে কাজ করতেন, রাজুর বাবা প্রয়াত বাবলু দে এক সময় মিউনিসিপালিটি মার্কেটে বিড়ির ব্যবসা করতেন। যদিও এই পরম্পরা কিন্তু রাজুর কন্যা বহন করবে না, সে ভাল ছাত্রী, ভবিষ্যৎ নিয়ে তার নিজস্ব ভাবনা চিন্তা আছে।

বিড়ি শ্রমিকদের দুরবস্থা চিরকালীন। সেই প্রায় ছয় দশক আগে আমি তখন ক্লাস এইটে পড়ি। একদিন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সুরেন্দ্র নাথ খান ভাদুড়ী আমাদের বাড়িতে এসে গুন্ডি মিশ্রিত পান মুখে পুরে মাকে বলেছিলেন "আপনার ছেলেটা পড়াশুনা কিসুই করে না। ওতো বিড়ি বাঁধবে আর গান গাইবে... আমি বন ফুল গো"। সাধারণ বিড়ি শ্রমিকরা আদ্যিকাল থেকেই অপাংক্তেয়, দুর্বল। এখনও সে অবস্থার কোনও পরিবর্তন চোখে পড়েনি। বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি জরুরি। আরও দরকার সরকারি সুবিধে সম্পর্কে শ্রমিকদের সচেতন করা। ওরা বড় কষ্টে আছে।

তাজ্জব মহাভারত

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

অনেক দিন আগেকার কথা। কৌরব-পান্ডবরা তখন ছোট। দিস্তং নদীর পাড়ের দেশ থেকে ভুসকু গেল হস্তিনাপুর বেড়াতে। তাঁর ইচ্ছে ভীমের সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু হস্তিনাপুরে সে জড়িয়ে পড়ল এক সঙ্কটে। কী সেই সঙ্কট? কেনই বা ভুসকু জড়িয়ে গেল তাতে? শুরু হল নতুন ধারাবাহিক।

১

ঋষি ভূতমিত্রের আশ্রমটা হস্তিনাপুর নগরীর উত্তরপ্রান্তে। নগরের বড়ো বড়ো রাজকর্মচারী ও ডাকসাইটে ব্যবসায়ী পরিবারের বালকেরা এই আশ্রমে থেকে লেখাপড়া করে। হস্তিনাপুর বিখ্যাত নগরী। তার কেন্দ্রে রাজপরিবারের বিশাল বিশাল প্রাসাদ। সেটা একটা ছোটখাটো শহরের মত। কৌরব-পাণ্ডবেরাও লেখাপড়া শিখছে, তবে তাঁদের জন্য আলাদা আশ্রম আর গুরু রয়েছে। রাজপ্রাসাদের চারদিকে বাকি হস্তিনাপুর নিশিদিন হরেক উত্তেজনায় গমগম করে। প্রতিদিন কতশত লোক যে নগরীতে আসছে, তা বলা মুশকিল। এদের মধ্যে কেউ আসে রাজাদের অস্ত্র ভাণ্ডারে আধুনিক প্রযুক্তির তির-গদা-ধনুক বেচতে, কেউ আসে সরেস লোহা কিনে নিজের এলাকায় বিক্রি করে বড়লোক হওয়ার আশায়, কেউ আসে স্রেফ রাজবাড়ি দেখতে আর হাওয়া খেতে। এছাড়া ভীষ্ম কিংবা দ্রোণের মত ব্যক্তির পরামর্শ নিতে কিংবা রাজকুমারদের সঙ্গে দেখা করার জন্য লোকও নেহাৎ কম আসে না। তবে বেশির ভাগই চায় দুর্যোধন, অর্জুন, ভীম— এদের সঙ্গে দেখা করতে। এর জন্য নাম লিখিয়ে তিন-চারমাস অপেক্ষা করতেও কেউ দু-বার ভাবে না। সব চাইতে বড় কথা হল হস্তিনাপুরে বহিরাগতদের জন্য বিরাট সরকারী ধর্মশালা আছে। সেখানে যদ্দিন খুশি বিনি পয়সায় থাকা-খাওয়া যায়।

আশ্বিন মাসে হস্তিনার আবহাওয়া বেশ মনোরম। বেলা সবে দ্বিতীয় প্রহরে পড়েছে। ভূতমিত্র ছাত্রদের শষ্যক্ষেত পরিদর্শনে পাঠিয়ে একটা বট গাছের তলায় বসে শ্লোক লেখার চেষ্টা করছিলেন। ক-দিন আগে আকাশে পূর্ণিমা চাঁদের শোভা দেখে তাঁর একটা শ্লোক রচনা করার কথা মনে হয়েছিল। খানিকটা লেখা হলেও শেষ হচ্ছে না। পিতামহ ভীষ্ম নিত্য নতুন শ্লোক শুনতে পছন্দ করেন। এই শ্লোকটা পছন্দ হলে কয়েক মোহর পুরস্কার লাভ নিশ্চিত। অবশ্যি ভীষ্মকে শ্লোক রচনা করে পাঠাবার মত মুনি-ঋষির অভাব নেই। রোজই নানান রাজ্য থেকে মুনি-ঋষির দল থলে ভর্তি করে শ্লোক এনে ভীষ্মের ব্যক্তিগত করণে 'শ্লোক বিভাগ'-এ জমা করছে। তবে ভূতমিত্র নিশ্চিত যে এই শ্লোকটা পুরো লেখা হয়ে গেলে পিতামহের পছন্দ হবেই।

অশ্বপদী ছন্দে শ্লোক লেখা সহজ ব্যাপার নয়। ভূতমিত্র 'আকাশ' শব্দের একটা জুৎসই প্রতিশব্দের কথা ভাবছিলেন আকাশের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ কী খেয়ালে চোখ নামিয়ে সামনে তাকাতে দেখলেন আশ্রমের প্রধান ব্যবস্থাপক গজদত্ত দাঁড়িয়ে আছে। ভূতমিত্রের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই গজদত্ত প্রণাম জানিয়ে বললেন, 'শ্লোক রচনায় ব্যস্ত ছিলেন বলে

ডাকি নি। একজন আগন্তুক এসেছেন।'

'আগন্তুক?'

'আজ্ঞে তিনি নাম বলেন নি। তবে অনুমান করি সুদূর উত্তরদেশের লোক। মনে হয় অসুর বংশীয়।'

'অসুর?' ভূতমিত্র তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। কয়েক যুগ আগে অসুরদের সঙ্গে সন্ধি হওয়ার পর হস্তিনা সহ বেশ কিছু অনসুর রাজ্য তাঁদের থেকে কৃষিকাজ শিখছে। সে সব শেখাবার জন্য কিছু অসুর হস্তিনায় কুরু সরকারের আতিথ্যে রয়েছেন। কিন্তু তাঁরা সবাই রাজমহল এলাকায় থাকেন। এর বাইরে অবশ্য কিছু কিছু অসুর পর্যটনের কারণে হস্তিনায় আছেন। তাঁদের কেউ দেখা করতে এল নাকি?

'চলো তো দেখি।' ভূতমিত্র হাঁটা দিলেন। বহিরাগতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য যে কুটির রয়েছে সেটা কম করে আধা ক্রোশ দূরে। ভূতমিত্র ঘোড়ায় চড়তে পছন্দ করেন না। বছর দুয়েক আগে কুরু সরকারের শিক্ষা বিভাগ থেকে প্রতিটি আশ্রমে একটা করে হাতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হস্তিনায় মাহুতের খুব অভাব। হস্তিবিদ্যা অসুরেরা ভাল জানে। বিনিময় প্রথা অনুযায়ী তাঁরা হস্তিনার কাছ থেকে ঘোড়ায় চড়া শেখে এবং হস্তিনাকে হাতি চালনা শেখায়। কিন্তু বর্তমান হস্তিনায় যত লোক হাতিবিদ্যা শিখেছে, তাঁরা সকলেই রাজার হাতি বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। এর বাইরে যে ক-টা লোক হাতিবিদ্যা জানে তাঁদের দর খুব চড়া। মাসে কম করে আট মোহর। তাই অধিকাংশ আশ্রমে হাতিগুলো স্রেফ ঘাস-পাতা খেয়ে সময় কাটাচ্ছে।

ভূতমিত্র হাঁফাতে হাঁফাতে সাক্ষাৎ করার কুটিরে ঢুকতেই একটা লোক উঠে দাঁড়াল। তাঁর চোখ-মুখ-চেহারা-গায়ের রঙ দেখেই বোঝা যায় অসুর বংশীয়। কিন্তু হস্তিনায় যে সব অসুর রয়েছে তাঁদের তুলনায় এ একটু আলাদা। চোখ-নাকের গড়নটা অন্য রকম। বয়স বেশি নয়।

'প্রণাম!' লোকটি বলল। 'আমার নাম ভুসুকু। আমি সুদূর উত্তর-পশ্চিম দেশ থেকে আসছি। কামরূপের নাম শুনেছেন নিশ্চই?'

'কামরূপ?' ভূতমিত্র আসন গ্রহণ করে ভুসুকুকে বসতে বললেন। 'সে দেশ থেকে হাতি আসে হস্তিনায়। এবার মনে পড়ছে গত বছর হস্তিমেলায় কামরূপ থেকে কয়েক জন বিশারদ এসেছিলেন। তোমার চেহারাটা তাঁদের মতই। তা কামরূপের কোথায় থাকো তুমি?'

'করতোয়া পেরিয়ে দিস্তং নদীর ধারে।'

'করতোয়ার নাম শুনেছি। সে নাকি বিরাট নদী! কিন্তু দিস্তং নামটা নতুন ঠেকছে।'

'ঘন অরণ্যের দেশে থাকি আমরা। সে অরণ্য পেরিয়ে আরো উত্তরে গেলে সুউচ্চ পাহাড়। সে পাহাড়ের মাথায় বরফ জমে থাকে।'

'বুঝেছি বুঝেছি!' ভূতমিত্র উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। 'সে পাহাড়ে কি পীত মানুষেরা বাস করে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার দেশ তো অনেক দূর। অসুর রাজ্যের শেষ সীমা। তা তুমি এলে কী ভাবে? আমাদের ভাষা যেভাবে বলছ তাতে তো মনে হচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরে হস্তিনায় আছ।'

'তা ধরুন বছর দুয়েক তো হবেই। আমার দেশের বিখ্যাত পর্যটন সংস্থা জল্পেশ চরৈবতীর অধ্যক্ষ আমার বাবার খুব পরিচিত। তিনিই কম খরচে আমাকে হস্তিনা ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমার সঙ্গে যাঁরা এসেছিল তাঁরা অবশ্যি গত বৈশাখেই দেশে ফিরে গেছে। আমি যাই নি। ভাবছি এখানে কোনও কাজ পেলে কয়েক বছর কাটিয়ে তবে ফিরব।'

'কাজ?' ভূতমিত্রের দু-চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। 'অসুর মাত্রেই কুরু রাজ্যের অতিথি। যদ্দিন খুশি বিনে পয়সায় থাকো খাও। মাসে তিন মোহর হাত খরচাও পাবে। এরপরে আবার কাজের খোঁজ কেন?'

'মাসে তিন মোহরে হস্তিনাপুরে খুব একটা কিছু ফুর্তি করা যায় না ঋষিমশাই!' ভুসুকু হাসল। 'শুনেছি আপনার একটা হাতি আছে।'

'তুমি হস্তিবিদ্যা জান?' ভূতমিত্র লাফিয়ে ওঠেন। 'কামরূপের লোকেরা তো হস্তিবিদ্যায় নিপুণ। তুমি নিশ্চই জান?'

ভুসুকু আবার একটু হেসে মাথা নাড়িয়ে বলল, 'জানি।'

'আমি কিন্তু বাপু মাসে পাঁচ মোহরের বেশি দিতে পারব না।'

'চলবে। তবে আমার হয়ে একটা কাজ করে দিতে

বছর দুয়েক আগে কুরু সরকারের শিক্ষা বিভাগ থেকে প্রতিটি আশ্রমে একটা করে হাতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হস্তিনায় মাহুতের খুব অভাব। হস্তিবিদ্যা অসুরেরা ভাল জানে। বিনিময় প্রথা অনুযায়ী তাঁরা হস্তিনার কাছ থেকে ঘোড়ায় চড়া শেখে এবং হস্তিনাকে হাতি চালনা শেখায়। কিন্তু বর্তমান হস্তিনায় যত লোক হাতিবিদ্যা শিখেছে, তাঁরা সকলেই রাজার হাতি বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। এর বাইরে যে ক-টা লোক হাতিবিদ্যা জানে তাঁদের দর খুব চড়া। মাসে কম করে আট মোহর।

হবে আপনাকে।'

'কী রকম?'

ভুসুকু একটু ক্ষণ চুপ করে কী জানি ভাবল। তারপর ধীর গলায় বলল, 'আমি রাজপুত্র ভীমসেনের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। নামও লিখিয়েছি। কিন্তু আগামি বছর কার্তিক মাসের আগে সাক্ষাৎ লাভের কোনও আশা নেই।'

প্রতিদিন অগণিত মানুষ রাজপরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার জন্য কুরু সরকারের করণে নিজেদের নাম নথীভুক্ত করে। সব চাইতে বেশি চাহিদা অর্জুন আর ভীমের। ভূতমিত্র তাই সমস্যাটা বুঝতে পারলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি কী করবেন সেটা বুঝতে পারলেন না। রাজকর্মচারিদের ছেলেরা তাঁর আশ্রমে শিক্ষালাভ করে। রাজমন্ত্রী, অমাত্য, মহামাত্যদের সঙ্গে তাই ভূতমিত্রের ভালই ওঠাবসা আছে।

'কথা দিতে পারছি না।' ভূতমিত্র জানালেন। 'তবে চেষ্টার ত্রুটি হবে না।'

'বেশ। আমি আজ থেকেই আপনার হাতিচালনার কাজে নিযুক্ত হতে চাই।'

'কিন্তু ভীমসেনের সঙ্গে তোমার কী দরকার?' মাহুত পাওয়ার আনন্দ চেপে রেখে জিগ্যেস করলেন ভূতমিত্র। 'গদা নির্মাণের নতুন কোনও নকশা আবিষ্কার করেছ নাকি? ভীমসেন কিন্তু সূর্য ছাপ গদা ছাড়া আর কোনও গদা ব্যবহার করবেন না বলে জানিয়েছেন।'

'গদা নয়।' ভুসুকু মৃদু স্বরে জানাল। 'তবে কারণটা আপনাকে এখনই বলব না।'

'বেশ। আমি চেষ্টা করব।'

২

হস্তিনাপুর রাজকীয় অঞ্চলে প্রবেশ করার জন্য চার দিকে চারখানা প্রবেশপথ রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি রাজ পরিবারের সদস্যদের ব্যবহারের জন্য। দক্ষিণের প্রবেশ পথটি সাধারণের জন্য খোলা। তবে অনুমতি ছাড়া রাজকীয় অঞ্চলে প্রবেশ নিষিদ্ধ। দক্ষিণ ফটকের কাছাকাছি বিরাট বাগান এবং রাজকীয় করণ। অনেকগুলি ভবন নিয়ে করণ গড়ে উঠেছে। ফটকের কাছাকাছি কয়েকটি ভবনে রাজপরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার জন্য নাম লেখানর ব্যবস্থা আছে। একশ জন করণিক সেই কাজে নিযুক্ত। বেলা তিন প্রহর অতিক্রান্ত হওয়ায় আজকের মত করণের কাজ প্রায় শেষের দিকে। নাম লেখাতে আসা লোকেরা প্রায় নেই বললেই চলে। করণিকরা তালপাতার গোছা মিলিয়ে মিলিয়ে সাজিয়ে রাখছিলেন। রাত্রী প্রথম প্রহর অন্তে হস্তিনা নগরীর মূল প্রেক্ষাগৃহে নারদমুণি এবং তাঁর সম্প্রদায়ের বীণা বাদনের অনুষ্ঠান আছে বলে করণিকরা চাইছিলেন একটু আগে বাড়ি পৌঁছোতে।

তখনই একটা কালো রঙের রথ এসে থামল করণের সামনে। রথের ঘোড়াটিও ঘোর কালো। একজনই আরোহী ছিলেন রথে। তিনিই সারথীর কাজ করছিলেন। নির্দিষ্ট স্থানে রথটিকে রেখে আরোহী দীপ্ত পদক্ষেপে করণের প্রবেশ করার মূল ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। তাঁর চেহারা তাম্রবর্ণের। উচ্চতা প্রায় চার হাত। চুল আর দাঁড়ির রঙ লাল। কোমরে ঝুলছে বিকট আকারের একটা খড়্গ। লম্বা লম্বা পায়ে সেই আগন্তুক একটা নাম লেখাবার ভবনে প্রবেশ করে একজন কর্মচারির সামনে এসে দাঁড়ালেন। লেখনির উল্টো দিক দিয়ে কান চুলকানো করণিক চমকে সোজা হয়ে বলল, 'বসতে আজ্ঞা হোক!'

'কাজের সময় নিশ্চই ফুরিয়ে যায় নি?' আগন্তুকের বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল।

'না না। বলুন কার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান?'

'দুর্যোধন।'

'দুর্যোধন?' করণিকের গলা একটু কেঁপে গেল।

'সমস্যা আছে?'

'না না।' করণিক কপালের ঘাম মুছলেন। 'সমস্যা কেন থাকবে! আপনি ইচ্ছে করলে আগামী কালই তাঁর সাক্ষাৎ পেতে পারেন। তবে কিছু সমস্যা যে নেই, তা কী করে বলি বলুন?'

'যেমন?'

'ইয়ে মানে— দুর্যোধন মহারাজের ব্যাপারটা হল তিনি কথা দিয়ে সাক্ষাৎ না-ও করতে পারেন। আবার সাক্ষাতের পর যদি আপনাকে পছন্দ না হয় তবে সাতদিনের জন্য কারাগারেও পাঠাতে পারেন।'

'জানি।' আগন্তুক হাসলেন। করণিক তাঁর ঝকঝকে দাঁতগুলো দেখতে পেল। 'আমার নাম নথিভুক্ত করুন।'

'বেশ।' এক টুকরো তালপাতা নিয়ে লেখনি বাগিয়ে করণিক জিগ্যেস করলেন, 'মহাশয়ের নাম?'

'ধুর্জটিবর্মা।'

'নিবাস?'

'লঙ্কাদেশ।'

করণিক আড় চোখে একবার আগন্তুকের চেহারাটা

পরখ করে নিয়ে শুকনো গলায় বলল, 'দুর্যোধন কিন্তু অসুরদের পছন্দ করেন না।'

'কে বলেছে আমি অসুর?' লোকটা ধমকে উঠল। গোটা ভবনটা যেন কেঁপে উঠল তাঁর গলার আওয়াজে।

'অসুর না হলে তো কোনও সমস্যাই নেই।' করণিক তাড়াতাড়ি বলে ওঠে। 'এই নিন অনুমতিপত্র। কাল দক্ষিণের ফটকের সামনে দ্বাররক্ষীকে দেখালেই ভেতরে যাওয়ার অনুমতি মিলবে। ফটক দিয়ে এক ক্রোশ গেলে দুর্যোধনের ব্যক্তিগত করণ। সেখানে আপনার জন্য রথ অপেক্ষা করবে। ব্যক্তিগত রথে যেতে পারবেন না।'

করণিক আরও কয়েকটা নিয়ম বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ততক্ষণে ধূর্জটিবর্মা নামক বিশাল চেহারার লোকটা হাঁটা দিয়েছে। করণিক তাঁর চলে যাওয়ার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে পাশের কর্মচারির দিকে ঝুঁকে পড়ে জিগ্যেস করলেন, 'লঙ্কাদেশ রাবণের নয়?'

'তাই তো জানি।'

'এ লোক রাক্ষস না হয়ে যায় না। তবে দেখতে তো একেবারে মানুষের মত!'

'সে দুর্যোধন বুঝবেন।' করণিক উত্তরীয়র প্রান্ত দিয়ে মুখের ঘাম মুছে বললেন।

ততক্ষণে গট গট করে করণ থেকে বেরিয়ে নিজের রথে উঠে পড়েছেন ধূর্জটিবর্মা। এবার তিনি রথটা আস্তে আস্তে চালাতে লাগলেন। জনাকীর্ণ রাজপথ ছেড়ে তাঁর রথ একটু পরে একটা গলিপথ ধরল। পাথর বাঁধান পথটা এঁকেবেঁকে অনেকটা দূর গিয়ে একটা বড় পুষ্করিনীর সামনে এসে দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। পুষ্করিণীর পূব দিকে উঁচু প্রাকার ঘেরা একটা কাঠের দ্বিতল গৃহ। ধূর্জটিবর্মার রথ সে বাড়ির দ্বারের সামনে থামল। রথ থেকে নেমে তিনি গৃহের মূল দরজায় তিনবার টোকা দিলেন। একটু পরে দরজা খানিকটা ফাঁক হল। ধূর্জটিবর্মা ভেতরে প্রবেশ করলেন। একজন ধূসর বর্ণের উত্তরীয় পরিহিত লোক তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল দোতলায়।

বাড়িটা বড় এবং অনেকগুলি ঘর আছে। কিন্তু পথ দেখান লোকটি ছাড়া আর কাউকে দেখলেন না ধূর্জটিবর্মা। অবশ্য এমনটাই হওয়ার কথা। গুরু অম্লরাজ অঙ্গার এ বাড়িতে কয়েক মাস হল গোপনে দু-তিনজন বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে বাস করছেন। ধূর্জটিবর্মা ছাড়া এ সংবাদ আর কেউ জানে না।

দোতলায় সার সার ঘরগুলি পেরিয়ে উত্তরপ্রান্তের ঘরটির সামনে এসে পথপ্রদর্শক দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঘরের দরজা বন্ধ। ধূর্জটিবর্মা ঘরের দরজায় টোকা দিলেন।

দরজা খুলে গেল। ভেতরটা ছায়া ছায়া। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে একজন ঘরের ঠিক মাঝখানে একটি সিংহাসনে পদ্মাসনে বসে আছেন। ধূর্জটিবর্মা ইশারায় পথপ্রদর্শককে চলে যেতে বলে ঘরের ভেতরে পা রাখলেন। ঘরে ঢোকা মাত্র দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

'প্রণাম গুরুদেব!'

'বসো।' শান্ত অথচ গভীর একটা স্বর শোনা গেল।

'এ ঘরে কোনও তৃতীয় ব্যক্তি নেই, অথচ দ্বার খুলল বা বন্ধ করল কে?'

'অবাক হয়েছ?' অম্লরাজ মৃদু হাসলেন। 'ধাতু নির্মিত সূত্র আর কয়েকটি চক্র দ্বারা এটা সম্ভব হয়েছে। আমার সিংহাসনের পাশে একটি চক্র রয়েছে। সেটা ঘুরিয়ে দিলেই দ্বার খোলে আর বন্ধ হয়।'

'এ কেবল আপনার পক্ষেই সম্ভব গুরুদেব!' অভিভূত স্বরে বললেন ধূর্জটিবর্মা। 'মায়া বিদ্যায় আপনার তুলনা কেবল দেবতারা।'

'কাজ হয়েছে ধূর্জটিবর্মা?'

'হয়েছে।'

'কবে সাক্ষাৎ হচ্ছে দুর্যোধনের সঙ্গে।'

'আগামী কাল।'

'অসামান্য!' অট্টহাসি বেরিয়ে এল অম্লরাজের গলা থেকে। হাসির ছন্দে দুলতে লাগল তাঁর শরীর। সহসা তাঁর সামনে একটি দীপ জ্বলে উঠল নিজের থেকে। সেই আলো গিয়ে পড়ল তাঁর মুখে। সে মুখে একাধিক ক্ষতচিহ্ন। ক্ষতগুলি তাঁর মায়াবিদ্যা চর্চার ফল। অম্লরাজের তীক্ষ্ণ নাসিকা, বুক পর্যন্ত কুঞ্চিত কেশদাম, দাড়ি-গোঁফহীন মুখ আর কপালে চকচকে লাল গোল্লামার্কা টিপ সেই দীপের আলোয় ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। কালপ্যাঁচার মত গোল গোল চোখদুটোর দিকে একটু ক্ষণ তাকিয়ে থেকে কেমন জানি ঝিম ধরে গেল ধূর্জটিবর্মার। তিনি তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিলেন।

'এতদিনে আমার স্বপ্ন সফল হতে যাচ্ছে ধূর্জটিবর্মা। হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসতে আমার আর বিলম্ব নেই! প্রথমে দুর্যোধনকে দিয়ে পান্ডবদের হত্যা করাব আমি, তারপর আমার হাতে দুর্যোধনের মৃত্যু!'

একজন ধূসর বর্ণের উত্তরীয় পরিহিত লোক তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল দোতলায়। বাড়িটা বড় এবং অনেকগুলি ঘর আছে। কিন্তু পথ দেখান লোকটি ছাড়া আর কাউকে দেখলেন না ধূর্জটিবর্মা। অবশ্য এমনটাই হওয়ার কথা। গুরু অম্লরাজ অঙ্গার এ বাড়িতে কয়েক মাস হল গোপনে দু-তিনজন বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে বাস করছেন। ধূর্জটিবর্মা ছাড়া এ সংবাদ আর কেউ জানে না। দোতলায় সার সার ঘরগুলি পেরিয়ে উত্তরপ্রান্তের ঘরটির সামনে এসে পথপ্রদর্শক দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঘরের দরজা বন্ধ। ধূর্জটিবর্মা ঘরের দরজায় টোকা দিলেন।

অম্লরাজ অঙ্গারের কথাগুলো ঘরের মধ্যে গম গম করতে লাগল। ধূর্জটিবর্মা কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

'কিছু বলতে চাও?'

'অনুমতি করুন।'

'বলো ধূর্জটি! বলো! সন্দেহ থাকলে নিরসন করো!'

'বলছিলাম যে দেবতারা কি কুরুবংশকে রক্ষা করার চেষ্টা করবেন না?'

'না।' ডান হাত বরাভয়ের ভঙ্গিতে তুলে বললেন অম্লরাজ। 'মূল দেবতারা বহু যুগ হল পৃথিবীতে আসা ছেড়ে দিয়েছেন। হস্তিনাপুরের পাশে গভীর অরণ্যে যে দেবদূতাবাস রয়েছে, সেখানে কয়েকজন দেবদূত থাকেন মাত্র। তাঁরা কেবল পর্যবেক্ষণ করেন। এর বাইরে তাঁদের কোনও ক্ষমতা নেই।'

'এ কি সত্য গুরুদেব?' বিস্ময়ে ফেটে পড়ে জিগ্যেস করলেন ধূর্জটিবর্মা। অম্লরাজ সেই বিস্ময় থেকে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, 'তোমার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত। তুমি কেন, কেউই এই কথা বিশ্বাস করবে না ধূর্জটি! এ সত্য কেবল জানেন পিতামহ ভীষ্ম আর যুধিষ্ঠির। আর জানি আমি! এই অম্লরাজ অঙ্গার!'

ধূর্জটিবর্মা এবার খুব হালকা বোধ করলেন। দেবতাদের হস্তক্ষেপ নিয়ে তিনি এতদিন অনেক ভেবেছেন। কিন্তু গুরুদেব তাঁর চোখ খুলে দিলেন।

৩

মদ্র দেশের একজন বিখ্যাত অস্ত্র ব্যবসায়ী কিছু নতুন অস্ত্র নিয়ে এসেছেন। কয়েক মাস অপেক্ষা করার পর তিনি পিতামহ ভীষ্মের সাক্ষাৎ পেয়েছেন আজ। নিজের প্রাসাদের বিরাট উদ্যানে একটি রত্নখচিত চন্দন কাঠের আসনে বসে তিনি অস্ত্রগুলি পরীক্ষা করবেন বলে অপেক্ষা করছেন। পেছনে কয়েকজন অতি উচ্চপদস্থ সেনাপতি দাঁড়িয়ে। অস্ত্র ব্যবসায়ীর লোকেরা একটি বড় আকারের গুলতি ঠেলে নিয়ে আসছিল। ভীষ্ম সেই গুলতিটি মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে পাশে দাঁড়ান ব্যবসায়ীকে বললেন, 'ক্ষেপণাস্ত্র নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ পিতামহ।'

'কী নিক্ষেপ করবে এটা?'

'আজ্ঞে এক প্রকার উচ্চপ্রযুক্তির অগ্নিগোলক। দুশো হাত দূরে অবস্থিত একটি রথকে পলকের মধ্যে ভস্ম করে দেবে এই গোলক।'

'ফাটবে তো?'

'আজ্ঞে??'

'অগ্নিগোলকের মূল সমস্যা হল দশটার মধ্যে ছ-টাই ফাটে না।'

'এখানেই আমাদের অসাধারণত্ব পিতামহ!' ব্যবসায়ী বিনয়ের অবতার হয়ে বললেন। 'আমাদের গোলকগুলি রোদে-জলে ফেলে রাখুন। ফাটার বেলায় কোনও নড়ন-চড়ন হবে না। দশে দশটাই ফাটবে।'

'নিক্ষেপ কর তবে।'

একটা গোলা নিক্ষিপ্ত হল। সেটা শূন্যে অর্ধবৃত্তাকার পথে উড়ে গিয়ে একটা রথের ওপর পড়ামাত্র 'ধুপ' করে ফাটল। পরমুহূর্তে লেলিহান আগুনে জ্বলে উঠল রথটা। একটু পরে দেখা গেল সেটা খাক হয়ে গেছে। ব্যাপারটা এতটাই চমৎকার যে সেনাপতিরা সবাই 'সাধু সাধু' বলে উঠলেন।

'সাধুবাদের কী দেখলে হে?' ভীষ্ম পেছনে তাকিয়ে ধমকের সুরে বললেন।

'আজ্ঞে আগুনের তেজটা কি প্রশংসনীয় নয়?' পদাতিক বাহিনীর পশ্চিম মন্ডলের উপপ্রধান থতমত গলায় বললেন।

'গুলতি থেকে রথ পর্যন্ত যেতে গোলাটা যত সময় নিয়েছে তাতে একটা শ্লোক গোটা উচ্চারণ করে ফেলা যায়। আমি বা অর্জুনের কথা ছাড়ো, কুরুবংশের সব চাইতে খারাপ তীরন্দাজও এই সময়ে চারটে তির ছুঁড়ে গোলাটাকে কাবু করে ফেলবে। এ গোলা চলবে না!'

ব্যবসায়ী ঢোঁক গিলে বললেন, 'ঠিক ঠিক। তবে দোদুল্যমান শরটা দেখাই।'

'বলো কী? এই তির কি ধনুক থেকে দুলতে দুলতে উড়বে?' ভীষ্মকে এবার একটু বিস্মিত দেখাল।

'ঠিক ধরেছেন পিতামহ! এই দেখুন।'

ভীষ্ম তিরটা হাতে নিলেন। সাধারণ তিরের তুলনায় বেশ লম্বা। ফলাটা যথেষ্ট শক্ত আর ধারাল। কিন্তু নতুন যেটা সেটা হল ফলার দু-আঙুল পেছনে একজোড়া ছোট ডানা লাগান। তিনি পাশ থেকে একটা ধনুক তুলে

নিয়ে তিরটা তাতে জুড়লেন। তারপর তিনশো হাত দূরে একটা আমগাছের মাথায় ঝুলিয়ে রাখা একখন্ড সাদা কাপড়ের দিকে তাক করে জ্যা মুক্ত করলেন তিরটাকে। প্রায় আড়াইশো হাত সোজা যাওয়ার পর তিরটা আচমকা একটা গোঁত্তা খেয়ে কাপড়টার অন্ততঃ পঞ্চাশ হাত ডান দিক দিয়ে উড়ে গেল।

সেনাপতিরা সাধুবাদ জানাতে গিয়ে নিজেদের সামলে নিল।

'ভেবে দেখুন পিতামহ!' ব্যবসায়ী একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন। 'শত্রুর দিকে সরাসরি নিক্ষেপ না করে একটু ডান কি বাঁ দিক ঘেঁসে এই শর নিক্ষেপ করলে শত্রু ভাববে সেটা পাশ দিয়ে চলে যাবে। তখনই সে শর গোঁত্তা খেয়ে—'

'থামো হে অর্বাচীন!' জোর ধমক দিলেন ভীষ্ম। 'এই তির ছোঁড়ার জন্য আলাদা করে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। মাঝে মধ্যে একটা-দুটো ছুঁড়ে শত্রুদের বিভ্রান্ত করা হয়ত যাবে, কিন্তু গোঁত্তা খাওয়া মানেই তিরের গতি কমে যাওয়া। কলাগাছ ভিন্ন আর কিছু এই গতিতে ভেদ করা অসম্ভব! অল্প কিছু রাখা যেতে পারে। আর কী আছে?'

'হস্তিভেদী বল্লম!'

'ওই লৌহদন্ডগুলোর কথা বলছ?'

'আজ্ঞে।'

'চলবে না।' ভীষ্ম আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। 'ভীম ছাড়া ওই বস্তু কেউ তুলতেই পারবে না। আর ভীম একটাই হয় বুঝলে?।'

আসলে পিতামহ ভীষ্মের আজ একটু ব্যস্ততাও আছে। গতকাল রাজকীয় প্রেক্ষাগৃহে স্বর্গীয় বীণাবাদনের পর নারদমুনি তাঁর অতিথি হয়েছেন। তিনি একটু আগে নিদ্রাত্যাগ করে প্রচুর ভোজনের পর প্রসন্ন মনে অপেক্ষা করছেন ভীষ্মের জন্য। কিছু উন্নত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পাওয়ার আশায় ভীষ্ম ছটফট করছিলেন মনে মনে। যুধিষ্ঠিরকেও আসতে বলেছেন সেখানে। দেবতাদের জ্ঞান ও গবেষণার সংবাদ নারদমুনির কাছ থেকে ভাল ভাবে পাওয়া যাবে। সে জ্ঞানের বেশিরভাগটাই দুরূহ। ভীষ্ম বুঝে উঠতে পারেন না। তবুও শুনতে ভারি ভাল লাগে।

ছোট একটি রথে চড়ে নারদমুণির ভবনের সামনে এসে থামলেন ভীষ্ম। সেই বিশাল অতিথিশালার অভ্যন্তরে একটি শ্বেতপাথর নির্মিত কক্ষে নারদমুণি অপেক্ষা করছিলেন পিতামহের জন্য। যুধিষ্ঠির তাঁর পদসেবা করছিল। ভীষ্ম প্রবেশ করতেই দু-জনে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল।

'মঙ্গল হোক!' ভীষ্ম হাসিমুখে বললেন। 'তারপর যুধিষ্ঠির! এতক্ষণে নিশ্চয়ই নতুন কোনও জ্ঞান তুমি লাভ করে ফেলেছ?'

'আশ্চর্য বাক্য শুনলাম পিতামহ! এই পৃথিবী নাকি আসলে গোলাকার! শূন্যে ভাসমান এক গোলক!'

'হতেই পারে বৎস্য! হতেই পারে!'

'কিন্তু এ কী ভাবে সম্ভব?'

'জানি না। এর ব্যাখ্যা দেবর্ষিই দিতে পারেন যুধিষ্ঠির। তাঁকেই জিগ্যেস কর।'

'সে না হয় আমি চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।' নারদমুণি মধুর স্বরে বললেন। 'তার আগে আমি অন্য একটি বিষয়ে কিছু বলতে চাই।'

'বলুন। যা ইচ্ছে বলুন!' ভীষ্ম আসন গ্রহণ করে বললেন।

'এ কেবল আপনারা দু-জনেই জানেন যে দেবদূতাবাসের অভ্যন্তরে একটি ষোল হাত ব্যাস বিশিষ্টি বৃত্তাকার পাশার ছক আছে। তা ধাতু এবং জটিল যন্ত্রদ্বারা নির্মিত।'

'জানি।' ভীষ্ম বললেন। 'এটাও জানি যে সে ছকে নিরন্তর পাশার দান পড়ছে। খেলা হচ্ছে। কিন্তু সবই হচ্ছে এক স্বয়ংক্রিয় ভাবে। দেখতে দেখতে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়।'

'খেলাটা আসলে পাশার চাইতে বহুগুণ জটিল একটা খেলা।' নারদমুণি একটু সুগন্ধি মশলা মুখে ফেলে বললেন। 'মুখ্য দেবতারা যেদিন শেষবার সশরীরে মর্ত্যে এসেছিলেন সেবারই এই যন্ত্র চালু করে দিয়ে যান। তাঁরা বলে গিয়েছিলেন, যেদিন থেকে সাদা গুটি দুর্বল হলে বুঝতে হবে কুরুরাজ্যে গভীর বিপদ আসছে।'

'কী ভাবে?'

'এ প্রশ্ন করবেন না পিতামহ!' নারদ বলে চললেন। 'জটিল এক সম্ভাবনার গণিত এই যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এ বিজ্ঞান সুদুর ভবিষ্যতে মানবজাতি আয়ত্ত্ব করবে। আপনারা শুধু পারবেন সাবধান হতে।'

পিতামহ ভীষ্মের আজ একটু ব্যস্ততাও আছে। গতকাল রাজকীয় প্রেক্ষাগৃহে স্বর্গীয় বীণাবাদনের পর নারদমুনি তাঁর অতিথি হয়েছেন। তিনি একটু আগে নিদ্রাত্যাগ করে প্রচুর ভোজনের পর প্রসন্ন মনে অপেক্ষা করছেন ভীষ্মের জন্য। কিছু উন্নত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পাওয়ার আশায় ভীষ্ম ছটফট করছিলেন মনে মনে। যুধিষ্ঠিরকেও আসতে বলেছেন সেখানে। দেবতাদের জ্ঞান ও গবেষণার সংবাদ নারদমুনির কাছ থেকে ভাল ভাবে পাওয়া যাবে। সে জ্ঞানের বেশিরভাগটাই দুরূহ। ভীষ্ম বুঝে উঠতে পারেন না। তবুও শুনতে ভারি ভাল লাগে।

'সাবধানতার কি প্রয়োজন হয়েছে দেবর্ষি।'

নারদ একটু ক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'সম্প্রতি পাশার দান সাদা গুটির বিপক্ষে যাচ্ছে। নজরদারিতে থাকা দেবদূতেরা এই বার্তাই পাঠিয়েছে আমাকে।'

ভীষ্মের চোখে মুখে কোনও বিচলন দেখা গেল না। তিনি শান্ত গলায় বললেন, 'পান্ডব আর কৌরবদের মধ্যে গোলমাল বাঁধানর প্রচেষ্টা ছাড়া আর কোনও বিপদ আছে বলে আমার জানা নেই। এ চেষ্টা অনেক দিন ধরেই চলছে। কিন্তু আমি সতর্ক থেকে সব চেষ্টাকে সমূলে বিনাশ করেছি। তথাপি এদিক থেকে কোনও বিপদ?'

'পাশার অবস্থান বলছে কেউ একজন সক্রিয় হচ্ছে। তাঁর অসীম ক্ষমতা।'

'কে?'

নারদ হাসলেন। কারণ এই প্রশ্নের জবাব তিনিও জানেন না। দেবতারা অলৌকিক কোনও ক্ষমতার অধিকারী নন। তাঁরা বৈজ্ঞানিক গণনার সাহায্যে অনুমান করতে পারেন, কিন্তু ভবিষ্যৎবাণী করতে পারেন না।

৪

হস্তিনা নগরের মূল বাজারটি বিরাট। ভুসুকু এর আগে দু-একবার সেখানে গেলেও তেমনভাবে কিছু কেনাকাটা করেনি। প্রায় দু-বছর মাছ না খেয়ে তাঁর মন অস্থির হয়ে ছিল। এখানকার মানুষ আবার মাছ খায় না। রাজকীয় ধর্মশালায় রকমারি খাবারের অভাব না থাকলেও সেখানে মাছে পাওয়া যেত না। মাছ রান্না সেখানে পুরোপুরি নিষিদ্ধ। হস্তিনার মানুষ পছন্দ করে মাংস, দুধ, ঘি আর মধু খেতে। শুকনো মিষ্টি কিছু পাওয়া যায়। সেগুলো দারুণ জনপ্রিয়। বাজারের আমিষ বিভাগে ভুসুকু প্রায় আধপ্রহর ধরে চক্কর কাটছে, কিন্তু সেখানে কেবল রকমারি মাংসের আয়োজন। গরু-মোষ-হরিণ-সজারু-বরাহ-ময়ূর সহ কত রকমের যে মাংস তা গুণে শেষ করা মুশকিল। কিন্তু মাছের চিহ্নমাত্র নেই।

হস্তিনার মূল বাজারে ভুসুকুর মত নতুন লোককে সাহায্য করার জন্য বাজার সমিতির সদস্যরা ঘুরে বেড়ান। তাঁদের একজন ভুসুকুকে অনেকক্ষণ ধরে ঘোরাঘুরি করতে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, 'মহাশয়কে কি কিছু সাহায্য করতে পারি?'

'মাছ পাওয়া যায় না এখানে?'

'মৎস্য?' সদস্যটি একটু হাসলেন। 'মৎস্য আবার বাজারে এসে কিনতে হয় নাকি? দু-তিন তাম্রমুদ্রা দিলেই ভৃত্যদের কেউ গঙ্গাতীরে গিয়ে জেলেদের কাছ থেকে এনে দেবে। একেবারে পুড়িয়ে এনে দেবে। তবে পয়সা খচ্চা করে মৎস্যপোড়া খাওয়া অপব্যায় ছাড়া আর কিছু নয়।'

'মৎস্য কি এখানে পুড়িয়ে খাওয়া হয়?'

'এ ছাড়া আর কোনওভাবে মৎস্য খাওয়া যায় নাকি? উদরক মুনির বৌ জাহ্নবীদেবী রচিত রন্ধন কৌমুদীর পুথিতে পষ্ট বলা হয়েছে যে মৎস্য হলো দশম শ্রেণীর খাদ্য। যে প্রাণী ডাঙায় উঠলেই পটল তোলে তা ভক্ষণ করা অনুচিত। তবে রুচি বৈচিত্র্যের জন্য পুড়িয়ে খাওয়া চলে। সৈন্ধব লবণ মিশিয়ে খেতে হবে অবশ্যি।'

'তা গঙ্গাতীরের কোথায় গেলে মাছ পাওয়া যাবে?'

'সতের সংখ্যক রাজপথ যে ঘাটে গিয়ে মিশেছে সেখানে যেতে হবে। জায়গাটা বেশ দূরে। আপনার কি নিজস্ব রথ আছে?'

'না। তবে একটা হাতি আছে।'

'আপনি মাহুত?' সদস্যের মুখচোখের ভাব এবার বিলকুল বদলে গেল। সে বেশ সম্ভ্রমের গলায় বলল, 'শুনেছি পূবদেশাগত মাহুতদের মৎস্যপ্রীতি আছে। আপনি কি সে দেশের?'

'বলতে পারেন।'

বলে হন হন করে হাঁটা দিল ভুসুকু। হাতিটাকে সে বাজারের ঢোকার মুখে হাতিশালে রেখে এসেছে। কিন্তু মাছ আনতে হাতি চড়ে যাবে না। রথ ভাড়া করলে তাড়াতাড়ি হবে। বাজারের চারপাশে ভাড়া নেওয়ার মত সারি সারি রথ দাঁড়িয়ে থাকে। তার একটার সারথিকে ভুসুকু জিগ্যেস

করল, 'সতের সংখ্যক রাজপথ যে ঘাটে মিশেছে, সেখানে যাব।'

'হুম। মৎসাবতার ঘাট।' সারথি জানাল। 'ফিরবেন কি?'

'হ্যাঁ।'

'এক রৌপ্যমুদ্রা।'

'ষাট তাম্রমুদ্রা দেব।'

'ঠিক আছে। পঁচাত্তর দেবেন।'

সত্তরে রফা হলো। সারথি রথ ছুটিয়ে দিল। একটু পরেই রথ গিয়ে পড়ল সতের সংখ্যক রাজপথে। সুপ্রশস্ত পাথর বাঁধান রাস্তা। দু-পাশে উদ্যান শোভিন প্রাসাদ, সুন্দর গৃহ। মাঝে মাঝে বাগান, পুষ্করিণী। হস্তিনাপুর সত্যিই দেখবার মত নগর। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর গঙ্গা দেখা গেল। চমৎকার হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে গেল ভুসুকুর।

মৎস্যাবতার ঘাটে জলযান মেরামত করা হয়। বহু মানুষ সে কাজে নিযুক্ত। দু-একজনকে জিগ্যেস করতেই মাছের ঘাঁটির খোঁজ পেয়ে গেল ভুসুকু। নদী লাগোয়া একটা লম্বা ঘর। দরজার সামনে একটা বিশাল চেহারার লোক মাটিতে বসে ঢুলছিল। ভুসুকু দাঁড়াতেই মাছের গন্ধ পেল। লোকটা ভুসুকুর আগমন টের পেয়ে লাল দুটো চোখ ওপরে তুলে জিগ্যেস করল, 'কী চাই?'

'মাছ পাওয়া যাবে?'

'যাবে। পুড়িয়ে নিয়ে যাবেন না বাড়ি গিয়ে পোড়াবেন।'

'কী মাছ পাওয়া যাবে?'

'রোহিত মৎস্যই চলে বেশি।'

'তাই দিন। কাঁচা পেলেই খুশি হব।'

'মাছ পোড়ান কিন্তু সোজা কাজ নয় মহাশয়!' লোকটা উঠতে উঠতে বলল। 'অথচ পোড়ানর জন্য আমি মাত্র এক তাম্রমূদ্রা অতিরিক্ত নিই।'

'কালো জিরে, কাঁচা লঙ্কা আর হলুদ দিয়ে রোহিত মৎস্যের ঝোল হয়। এদেশে এসবের চল নেই।'

'ঝোল?' লোকটা লাল দুটো চোখ মেলে খানিকক্ষণ ভুসুকুর দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর একটু হেসে বলল, 'ঝোল ব্যাপারটা আমার জানা নেই মহাশয়। শুনেছি মৎস্যপাকের আরো নিয়ম আছে। কিন্তু আপনি যে মশলা দুটোর কথা বললেন, তা হস্তিনায় কেবল পাওয়া যাবে সুরদত্তর কাছে। আপনি কি তাঁর বাড়ি দেখেছেন?'

'কোথায় সেটা?'

'বাজারের কাছাকাছি একটা বিচিত্র রঙে রাঙান বিপুল প্রাসাদ দেখেন নি?'

'ওটাই বুঝি? সে তো বিরাট ব্যাপার। আমি তো ভেবেছিলাম ভীষ্ম বা ধৃতরাষ্ট্রের কোনও বিশেষ মহল।'

'মশলার ব্যবসা করে সে যা সম্পদ করেছে তা কুরুপরিবারের তুলনায় কম কিছু নয়। দুর্যোধন তো প্রায়ই তাঁর প্রাসাদে আসেন দুর্মূল্য রত্ন দেখতে।'

'সেখানে হলুদ আর কালো জিরে পাব বলছেন?'

'নিশ্চই পাবেন মহাশয়। তবে এক থলে মোহর নিয়ে যাবেন। মাছ কি পুড়িয়ে দেব?'

'কাঁচাই দিন।'

লোকটি থতমত খেয়ে ভেতরে চলে গেল। তারপর একটা রুই মাছ ভাল করে পাতা দিয়ে মুড়তে মুড়তে ভাবল, নতুন ক্রেতার মাথায় নির্ঘাৎ গোলমাল আছে। হলুদ আর কালো জিরের মত মশলা কিনতে গেলে কমপক্ষে রাজদরবারের অমাত্য হতে হবে। কিন্তু এই ক্রেতাকে দেখে মোটেই তা মনে হচ্ছে না। নইলে কেউ নিজে আসে মাছে কিনতে?

একটু পরে মাছ নিয়ে রথে উঠতেই সারথী ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসু গলায় বললেন, 'মাছ নিলেন, পুড়িয়ে নিলেন না তো?'

'মাছের ঝোল খেয়েছেন কখনও?'

'মৎস্য আবার বাজারে এসে কিনতে হয় নাকি? দু-তিন তাম্রমুদ্রা দিলেই ভৃত্যদের কেউ গঙ্গাতীরে গিয়ে জেলেদের কাছ থেকে এনে দেবে। একেবারে পুড়িয়ে এনে দেবে। তবে পয়সা খচ্চা করে মৎস্যপোড়া খাওয়া অপব্যায় ছাড়া আর কিছু নয়।'

'মৎস্য কি এখানে পুড়িয়ে খাওয়া হয়?'

'এ ছাড়া আর কোনওভাবে মৎস্য খাওয়া যায় নাকি? উদরক মুনির বৌ জাহ্নবীদেবী রচিত রন্ধন কৌমুদীর পুথিতে পষ্ট বলা হয়েছে যে মৎস্য হলো দশম শ্রেণীর খাদ্য। যে প্রাণী ডাঙায় উঠলেই পটল তোলে তা ভক্ষণ করা অনুচিত। তবে রুচি বৈচিত্র্যের জন্য পুড়িয়ে খাওয়া চলে। সৈন্ধব লবণ মিশিয়ে খেতে হবে অবশ্যি।'

'এ খাদ্যের কথা তো কখনও শুনিনি মহাশয়? তবে আমার আবার নিত্যনতুন খাদ্য বেশ পছন্দের। ভোজন কৌমুদীর প্রায় সব রান্নাই আমার বউ করে ফেলেছে।'

'খাবেন?'

'সত্যি বলতে কি বেশ কৌতূহল হচ্ছে। কিন্তু মাছপোড়া খেয়ে আমার ভালো লাগে নি। মাছ কি সুস্বাদু খাদ্য?'

'খেয়েই দেখুন। আমি ভূতমিত্রের আশ্রমের মাহুত। সেখানে আমার স্বাধীনভাবে থাকার জন্য একটি গৃহ আছে। সেখানে গিয়ে মাছের ঝোল আর ভাত খাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই।'

'তবে সত্তর তাম্রমুদ্রার ব্যাপারটা ভুলে যান। চাইলে গোটা হস্তিনাপুর ঘুরিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু মাছের ঝোল দিয়ে ভাতটা ছাড়া যাবে না মহাশয়। যদিও ভাত ভক্ষণে শরীরে আলস্য আসে— তা সে না হয় এলো! আমার নাম উচ্চকপাল।'

খুব খুশির সঙ্গে জানালেন তিনি। ভুসুকু হেসে বলল, 'আমার নাম ভুসুকু।'

'হস্তিবিদ্যা জানেন আপনি— তার মানে আপনি অনেক কিছু জানেন। ওই পাহাড়ের মত জন্তুটাকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা ভাবলেই আমার জ্বর আসে। তবে চড়তে দিব্যি লাগে। মেলায় চড়েছিলাম একবার। তবে দর খুব চড়া। মাথাপিছু এক মোহর। আচ্ছা, আপনি কি জাতে অসুর?'

ভুসকু জবাব না দিয়ে একটু হেসে বলল, 'চলুন তবে বাজার থেকে হাতি চেপে আশ্রমে যাওয়া যাক।'

'বলেন কী মহাশয়?' উচ্চকপাল আনন্দে নেচে ওঠে। 'এত ভাবতেই পারছি না। আচ্ছা, আপনি আশ্রমের হাতির দায়িত্ব নিয়েছেন কেন? চাইলে আপনি উচ্চ বেতনের মাহুত হতে পারেন। আমার কাছে তেমন সংবাদ আছে। বিখ্যাত কাষ্ঠ বণিক বনস্পতিবাবু মাহুতের জন্য কোথায় কোথায় না খোঁজ করছেন। বলব তাঁকে?'

'কোনও দরকার নেই।'

উচ্চকপাল এবার অবাক হয়ে তাকাল ভুসুকুর দিকে। বলে কি লোকটা? হস্তিবিদ্যা জানে অথচ মোটা উপার্জন করতে চায় না— এ কেমন কথা!

'চলুন তবে বাজারের দিকে যাওয়া যাক।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। চলুন।'

উচ্চকপাল রথ ছোটাল। ভুসুকু নামটার মত লোকটাকেও একটু অদ্ভুত মনে হচ্ছে। কিন্তু সে সব নিয়ে ভেবে লাভ নেই। মাছ যে সুস্বাদু খাদ্য হতে পারে, সেটা পরীক্ষা করার জন্য তাঁর মন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু লোকটা কি কালো জিরে আর হলুদ সত্যিই কিনবে?'

'হাতি বের করার আগে কিন্তু সুরদত্তের দোকানে যেতে হবে।'

ভুসুকুর গলা শুনল উচ্চকপাল। এবার সে নিশ্চিত হলো যে লোকটা খানিকটা বায়ুরোগে আক্রান্ত হলেও হতে পারে। কিন্তু মাছের ঝোলের কথাটা ভেবে সে সেই ব্যাপারটাও ভুলে গেল।

(ক্রমশ)

টাইটেল স্কেচ অভিজিৎ সরকার

কভার স্টোরি

ডেস্টিনেশন বাগডোগরা মুখোশের মিউজিয়াম

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

আজকাল সবাই ছুটছি বাগডোগরা। নেপাল বাংলাদেশ দার্জিলিং গ্যাংটক ডুয়ার্স বিহার বা কোচবিহার সব পথ এসে মিলেছে বাগডোগরায়। সে পথের চেহারাই আজ বদলে গিয়েছে। বাগডোগরায় যেতে আজ আর জ্যামের ভয় নেই, প্রশস্ত উড়াল পুল আপনাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে যাবতীয় যানজটের ওপর দিয়ে। তেমনই ঝকাস তৈরি হচ্ছে ডুয়ার্স থেকে বাগডোগরার পথ, শহর শিলিগুড়ির মন্থরতম ট্রাফিক এড়িয়ে নৌকাঘাট মেডিক্যাল হয়ে সোজা তরাই সুন্দরী বাগডোগরা। উত্তরের তরুণ এয়ারপোর্ট বাগডোগরায় গত কয়েকবছরে যাত্রী সমাগম বহুগুণে বেড়েছে, ভোর থেকে সন্ধেরাত রীতিমত হিমসিম খেতে থাকেন কর্মীরা। শীগগিরি সুবিস্তার ঘটছে এই হাওয়াই আড্ডার, আন্তর্জাতিক উড়ান নেটওয়ার্কে ভুটান ও থাইল্যান্ডের পর জুড়তে যাচ্ছে নেপাল ও বাংলাদেশ।

স্বাভাবিক কারণেই একই সঙ্গে প্রসার ঘটছে পর্যটন শিল্পের। ইনবাউন্ড টুরিজমে আসতে চলেছে বেশ বড়সড় বুম। এয়ারপোর্টের কথা ছেড়েই দিলাম, বাগডোগরা ল্যান্ডস্কেপও অসাধারণ, চোখ জুড়নো। আকাশ পথে নেমেই টুরিস্টের মন ভাল করে দিতে পারে। এরকম একটি জায়গাতেই তো গড়ে ওঠা উচিত মনোহরণ সব তারকাখচিত ইকো-রিসর্ট! আর তার সঙ্গে সর্বজাতের টুরিস্টের জন্য দেশজ ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির স্থায়ী প্রদর্শ-শালা! যেখানে স্থায়ী দর্শক স্থানীয় গ্রামীণ জনসত্ত্বা। পরিযায়ীরা সামান্য টিকিট কেটে দেখবেন স্থানীয় প্রাচীন কৃষ্টি ও অতীত সম্পদের নমুনা। থাকবে মিউজিয়াম গ্যালারি, মঞ্চ, গেস্ট হাউস। কর্মসংস্থান হবে স্থানীয় যুবক যুবতীদের। একেবারেই কপিবুক ইকো সাস্টেনেবল টুরিজম।

আর ভাবনাটি একেবারে জব্বর ছিল ডঃ ওম প্রকাশ ভারতীর নিঃসন্দেহে। বিহারের সহর্স আদি নিবাস। ভারত সরকারের অধীনস্থ পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ডিরেক্টর পদে আসীন ছিলেন বেশ কিছুদিন। উত্তরপূর্ব ভারতের সংস্কৃতি নিয়ে বেশ কিছু গবেষণামূলক বই লিখেছেন। মিউজিয়াম করার ভাবনা তাঁর বহুদিনের। তাঁর বক্তব্য, শেকড়বাকড়হীন মানুষকে জোর করে হলেও তাঁর ঐতিহ্য নমুনা দেখাতে হবে, তাঁকে দিতে হবে প্রাচীনের সন্ধান। যাতে তাঁর মধ্যে প্রচ্ছন্ন অহংকার মোমবাতির নরম এক আলো হয়ে জেগে থাকে। সিকিমে ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছে মিউজিয়াম।

সংস্থার নাম হিমালয় ওয়র্ল্ড মিউজিয়ম। বাগডোগরা বিমানবন্দর পেরিয়ে ইসলামপুর অভিমুখে কিলোমিটার খানেক গেলেই ডানহাতের রাস্তায় ঢুকে শেষ মাথায় চালু আছে মুখোশের মিউজিয়াম। হিমালয়ের নদী অধ্যুষিত এলাকার প্রাচীন জনজাতির অন্যতম কারুশিল্পের নমুনা এই মুখোশ, যার বৈচিত্র্য মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে পৃথিবীর যে কোনও গবেষক-পর্যটকের। আপাতত কালেকশন সেন্টারে চলেছে মিউজিয়াম, জায়গা অপ্রতুল, সংগৃহীত মুখোশের সংখ্যা ৮০০ হলেও প্রদর্শিত হয়েছে ২৬৫টি। বাকিরা অপেক্ষা করছে নতুন ক্যাম্পাসে বড় আকারের মিউজিয়ামের জন্য, যার নির্মাণ কাজ শুরু হচ্ছে শীঘ্রই।

ছুটির দিনে আমাদের মত যে কোনও ইচ্ছুক মানুষের গন্তব্য হতেই পারে এই মাস্ক মিউজিয়াম, হিমালয়ান মুখোশ ও বাদ্যযন্ত্রের স্থায়ী প্রদর্শনী।

ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ফেসবুকে ঃ Himalaya Vishwa Sangrahalay

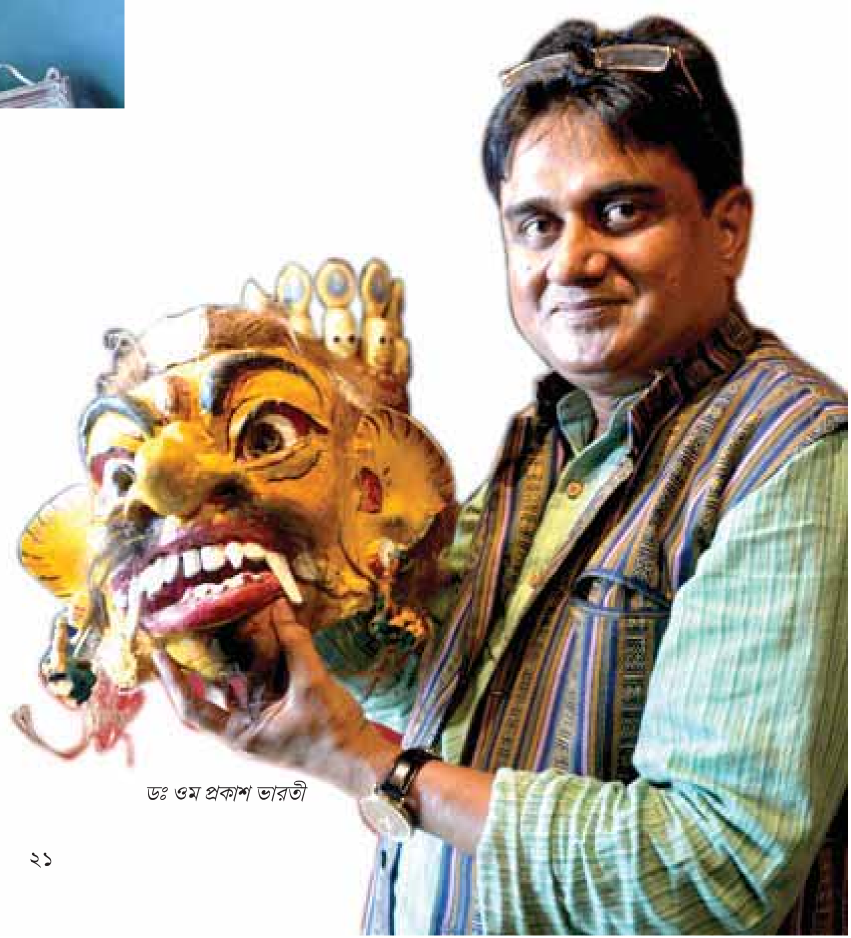

ডঃ ওম প্রকাশ ভারতী

ভারতীয় নারীর গর্ভপাতের অধিকার

রাখি পুরকায়স্থ

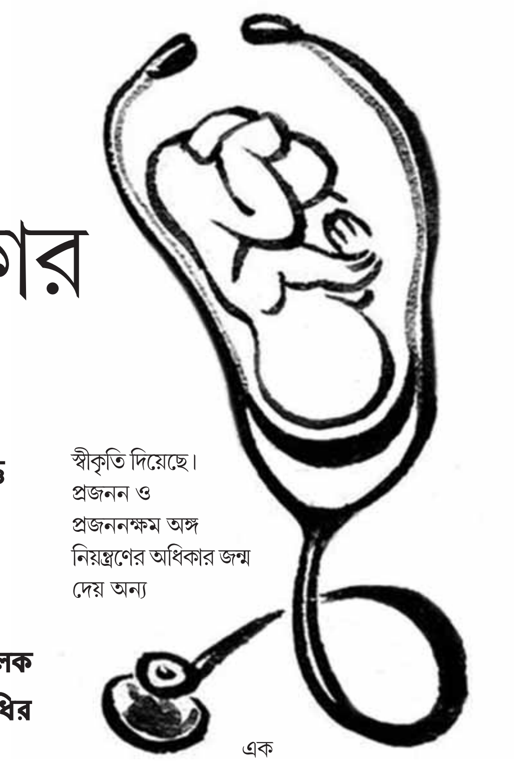

বহু প্রাচীন কাল থেকেই ধর্মীয় ও নৈতিক বাধানিষেধ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতীয় বিধানকর্তারা গর্ভপাত ঘটানোর প্রক্রিয়াকে রোধ করবার উদ্দেশ্যে ফৌজদারি আইন জারি করে এসেছেন। ভারতের মত দেশ, যেখানে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা এবং কঠোর নৈতিক বিধি প্রদত্ত শক্তিতে বলিয়ান হয়েই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়মনীতি স্থায়ীত্ব লাভ করে, সেখানে যে গর্ভপাতকে পাপ ও অনৈতিকতার সাথে সমান নজরে দেখা হবে, তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। তবে একথাও সত্যি, আইন সর্বদা মানবজীবনকে পবিত্র বলে মনে করে এবং মানুষের জীবনের জন্য নির্ধারিত এই আইনি সুরক্ষা মাতৃগর্ভে থাকা অজাত শিশুটির ক্ষেত্রেও সমানভাবে কার্যকর। তাই স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ অনুসারে গর্ভপাত একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। গর্ভপাতের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ধারাগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩১২ থেকে ৩১৬ ধারাগুলিতে পরপর বর্ণিত হয়েছে, যা নিম্নরূপ—

১) গর্ভপাত ঘটানো ঃ যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত ঘটায় এবং সেই গর্ভপাত যদি সেই নারীর জীবনরক্ষা করবার শুভবিশ্বাসে না হয়, তাহলে সেই ব্যক্তির ৩ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা দুই-ই ধার্য হবে, এবং নারীটি যদি ‘পরিণত-গর্ভা’ হয়, তাহলে দণ্ডাদেশ ৭ বছর পর্যন্ত হতে পারে এবং সেই সঙ্গে জরিমানাও ধার্য হবে। যদি কোনও নারী স্বয়ং নিজের গর্ভপাত ঘটায়, তাহলে সেও এই ধারার আওতায় পড়বে। (৩১২ ধারা)

২) নারীর সম্মতি ছাড়া গর্ভপাত ঘটানো ঃ এর আগের ধারায় যে অপরাধের কথা বলা হয়েছে, সেটি যদি সেই নারীর সম্মতি ছাড়া ঘটে, তাহলে নারী ‘পরিণত-গর্ভা’ হোক বা না হোক, এর জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং সেইসঙ্গে জরিমানাও ধার্য হবে। (৩১৩ ধারা)

৩) গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে মৃত্যু ঃ কেউ যদি গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে এমন কোনও কাজ করে যার ফলে নারীটির মৃত্যু হয়, তাহলে সেই ব্যক্তির দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং সেইসাথে জরিমানাও ধার্য হবে। এই কাজ যদি নারীর সম্মতি না নিয়ে হয়, সেক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা উপরে উল্লিখিত দণ্ড ধার্য হতে পারে। এই কাজের ফলে মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে তা জানা না থাকলেও গর্ভপাতকারী এই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হতে পারে। (৩১৪ ধারা)

৪) জীবন্ত অবস্থায় সন্তান যেন না জন্মায় সেই চেষ্টা করা অথবা জন্মের পরে তার মৃত্যু ঘটানো ঃ যদি কেউ গর্ভস্থ শিশুর জন্মের আগে তার জীবন্ত অবস্থায় জন্ম

ভারতীয় আইনে গর্ভপাত মানেই কিন্তু অপরাধ নয়। ১৯৭১ সালে প্রণীত ‘চিকিৎসাগত কারণে গর্ভপাত আইন, ১৯৭১’ ভারতীয় নারীর গর্ভপাতকে বৈধতার দানের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩১২ থেকে ৩১৬-তে বর্ণিত ফৌজদারি বিধানগুলি একটু সতর্ক দৃষ্টিতে দেখলেই বোঝা যায়, চিকিৎসাগত কারণে গর্ভপাত আইন, ১৯৭১ আসার পূর্ব পর্যন্ত ভারতে গর্ভপাত সংক্রান্ত আইন অত্যন্ত কঠোর ছিল।

নেওয়া রোধ করতে অথবা জন্মাবার পর তার মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্যে কোনও কাজ করে এবং তার ফলে শিশু জীবন্ত অবস্থায় জন্মাতে না পারে কিংবা জন্মের পর তার মৃত্যু ঘটে, এবং এই কাজটি যদি মায়ের জীবন রক্ষা হবে এই শুভ-বিশ্বাসে না করা হয়, তাহলে সেই ব্যক্তির দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা দুই-ই হবে। (৩১৫ ধারা)

৫) ‘পরিণত-গর্ভা’ নারীর গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু ঘটানো যা নরহত্যার পর্যায়ে (culpable homicide) পড়ে ঃ যদি কেউ কোনও একটা পরিস্থিতিতে এমন একটা কাজ করে, যার ফলে কোনও মৃত্যু ঘটলে সেটা নরহত্যার পর্যায়ে পড়বে; এবং সেই কাজের দরুণ একটি ‘পরিণত-গর্ভা’ নারীর গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু ঘটে, সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং জরিমানা দুই-ই হবে। (৩১৬ ধারা)

নারীর কি তবে গর্ভপাতের অধিকার নেই?

গর্ভপাতের অধিকার নিয়ে বিতর্ক প্রচুর। নারীর গর্ভপাতের অধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্নে বিচারকেরা তাঁদের অসংখ্য রায়দানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। ভারতীয় সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদে মানুষের জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের অভিভাবক হিসেবে অনুচ্ছেদ ২১-কে ব্যাখ্যা করে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত ব্যক্তির শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর নিজের সম্পূর্ণ অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রজনন ও প্রজননক্ষম অঙ্গ নিয়ন্ত্রণের অধিকার জন্ম দেয় অন্য এক অধিকারের, তা হল গর্ভপাতের অধিকার। ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের রায় মোতাবেক, ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার (Right to Privacy) নাগরিকদের মৌলিক অধিকার। নারীর গর্ভপাতের অধিকার সেই ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। একজন নারীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে, গর্ভধারণের পর তিনি সন্তান প্রসব করবেন না গর্ভপাত করাবেন, কারণ সম্পূর্ণ বিষয়টিই তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারের মধ্যে পড়ে।

চিকিৎসাগত কারণে গর্ভপাত আইন, ১৯৭১ (Medical Termination of Pregnancy Act– 1971)

ভারতীয় আইনে গর্ভপাত মানেই কিন্তু অপরাধ নয়। ১৯৭১ সালে প্রণীত ‘চিকিৎসাগত কারণে গর্ভপাত আইন, ১৯৭১’ ভারতীয় নারীর গর্ভপাতকে বৈধতার দানের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩১২ থেকে ৩১৬-তে বর্ণিত ফৌজদারি বিধানগুলি একটু সতর্ক দৃষ্টিতে দেখলেই বোঝা যায়, চিকিৎসাগত কারণে গর্ভপাত আইন, ১৯৭১ আসার পূর্ব পর্যন্ত ভারতে গর্ভপাত সংক্রান্ত আইন অত্যন্ত কঠোর ছিল। ১৯৭১ সালে আইনটি প্রণয়ন করবার আগে প্রতি বছর ভারতে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ ‘প্ররোচিত গর্ভপাত’ ঘটানো হত, যার মধ্যে ত্রিশ লক্ষেরও বেশি গর্ভপাত ছিল অবৈধ! এসময় গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে প্রায় এক-সপ্তমাংশ শাস্তি এড়াতে হাতুড়ে ডাক্তার, কিংবা নার্স, ধাই প্রভৃতি অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য ব্যক্তিদের সাহায্যে বেআইনি পথে কঠোর গোপনীয়তা বজায় রেখে গর্ভপাত ঘটাতেন। ষাটের দশকের শুরুতে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে শুরু হয় এক দশকব্যাপী এক গণবিতর্কের, যার ফলস্বরূপ গঠিত হয় শান্তিলাল শাহ কমিটি। এই কমিটি গর্ভপাত সংক্রান্ত আইনের উদারীকরণ এবং বৈধকরণের

প্রয়োজনীয়তার উপর একটি ইতিবাচক প্রতিবেদন পেশ করে। এর ফলশ্রুতিতে গর্ভপাতের জন্য উপযুক্ত নিয়ন্ত্রক কাঠামো এবং প্রয়োজনীয় আইন নিয়ে একটি সুদীর্ঘ বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। ১৯৭১ সালে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত 'চিকিৎসাগত কারণে গর্ভপাত আইন' সেই বিতর্কেরই ফল।

শুধুমাত্র চারটি পরিস্থিতিতে আইনসম্মত উপায়ে গর্ভপাত সম্পন্ন করা যেতে পারে

কখন কোন পরিস্থিতিতে আইনসিদ্ধভাবে গর্ভপাত করা যাবে তা চিকিৎসাগত কারণে গর্ভপাত আইনে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে। এই আইন প্রণয়নের ফলে রেজিস্টার্ড চিকিৎসক দ্বারা ক্ষেত্র বিশেষে গর্ভপাত করানো সম্ভব। তবে গর্ভাবস্থার অবসান ঘটানো নারীর একার ইচ্ছের ওপর নির্ভরশীল নয়, এটি সম্পূর্ণরূপে পরিস্থিতি নির্ভর। এই আইনে নিম্নোক্ত চারটি পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে যেক্ষেত্রে একজন মহিলা আইনত তাঁর গর্ভাবস্থাকে সমাপ্ত করতে পারেন—

যদি গর্ভাবস্থা বেশিদিন চলে, তবে গর্ভবতী নারীর জীবনের ঝুঁকি থাকবে অথবা তাঁর গুরুতর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে।

যদি শিশুটি জন্মায়, তাহলে শারীরিক ও মানসিক অস্বাভাবিকতার কারণে তার গুরুতরভাবে প্রতিবন্ধী হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা বর্তমান।

যদি নারীটি অভিযোগ করেন যে তাঁর গর্ভসঞ্চার ধর্ষণের ফলে হয়েছে। (এক্ষেত্রে ধর্ষণ প্রমাণ করা জরুরি নয়)

যদি জন্মনিয়ন্ত্রণের যে পদ্ধতি ও কৃতকৌশল ব্যবহার করা হয়েছিল তা কাজ না করায় গর্ভসঞ্চার হয়ে থাকে। (এটি শুধুমাত্র বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

গর্ভবতীর ইচ্ছেতে গর্ভপাত নয়, রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত

সংশ্লিষ্ট আইন মেনে যদি রেজিস্টার্ড চিকিৎসক গর্ভমোচন করেন, তাহলে তিনি ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ বা অন্য কোন আইনের ধারায় অভিযুক্ত হবেন না। কোনও মহিলার গর্ভপাত ঘটানো হবে না হবে না, তা সম্পূর্ণরূপে সেই চিকিৎসকের বিবেচনার ওপর নির্ভর করবে। গর্ভধারণের ১২ সপ্তাহের মধ্যে যদি গর্ভপাত ঘটাতে হয়, সেক্ষেত্রে একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের সম্মতিই যথেষ্ঠ। গর্ভধারণ করবার ১২ সপ্তাহের পর কিন্তু ২০ সপ্তাহের আগে গর্ভপাত ঘটাতে হলে, অন্তত দু'জন রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের সম্মতি আদায় করা জরুরি।

প্রাপ্তবয়স্ক নারীর গর্ভপাতের পূর্বে স্বামী কিংবা পরিবারের সম্মতি গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন

১৮ বছরের ঊর্ধে (বিবাহিত বা অবিবাহিত) যে কোনও মহিলার গর্ভপাতের অধিকার আছে, স্বামী বা পরিবারের অনুমতি ব্যতিরেকেই। তবে ভারতের বাস্তব ছবিটা কিন্তু একেবারেই আলাদা। গর্ভস্থ শিশুর জন্মের বিষয়ে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন সেই বিবাহিত মহিলার স্বামী অথবা শ্বশুরবাড়ির লোকজন। অবিবাহিতের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তাঁর পরিবার, পরোক্ষে সমাজ! মহিলাটির ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে কোনও গুরুত্বই দেওয়া হয় না। অথচ চিকিৎসাগত কারণে গর্ভপাত আইন স্বামী বা পরিবারের অনুমতি সাপেক্ষে গর্ভপাত সম্ভব, এ কথা কখনই বলে না। তবে ১৮ বছরের নীচে বা মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলার ক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতি প্রয়োজন।

আইনি জটিলতা ও জারি থাকা সমস্যা

ভ্যাটিকান সিটি ও চিলির মত দেশগুলি (যেখানে যে কোনও পরিস্থিতিতেই গর্ভপাত বেআইনি) প্রণিত আইনের সাথে চিকিৎসাগত কারণে গর্ভপাত আইনের তুলনা করলে, গর্ভপাত সংক্রান্ত আইনের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি সুস্পষ্টরূপে অনুভাবন করা যায়। তবে, এই আইনে যে নারীদের 'সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা' সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হয়েছে তা স্বীকার না করে উপায় নেই। এই আইন গর্ভপাতের জন্য শুধুমাত্র পরিস্থিতিগত কারণগুলিকেই বৈধ্যতা প্রদান করে। সার্বিকভাবে নারীদের নিজের দেহের উপর সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ নারীদের পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে স্বীকার করা হচ্ছে না! 'গর্ভপাতের অধিকার' বলতে যা বোঝায়, প্রকৃতপক্ষে আজও ভারতীয় নারীদের তা নেই।

গর্ভধারণের ২০ সপ্তাহ পর গর্ভপাত আইনবিরুদ্ধ কেন?

চিকিৎসাগত কারণে গর্ভপাত আইন অনুযায়ী, গর্ভধারণের পর কেবলমাত্র ২০ সপ্তাহ পর্যন্ত গর্ভপাত করা যেতে পারে। 'ভ্রূণের লিঙ্গ-নির্ধারণ জনিত গর্ভপাত' প্রতিরোধ করার জন্য এই নিয়মটি এই আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, কারণ ১৯৭১ সালে যখন আইনটি হয়, তখন শুধুমাত্র গর্ভধারণের ২০ সপ্তাহ অতিক্রমণের পরেই ভ্রূণের লিঙ্গ-নির্ধারণ করা সম্ভবপর হত। তবে এই আইনটি বর্তমান সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে-সাথে এই পরীক্ষাটি এখন অনেক আগেই সফলভাবে সম্পাদিত হয়। নতুন একটি রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে গর্ভাবস্থার সাত সপ্তাহের মধ্যেই ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করা সম্ভব। Chorionic villus sampling (CVS)-এর মাধ্যমে গর্ভধারণের ১০ থেকে ১২ সপ্তাহের মধ্যেই ভ্রূণের লিঙ্গ অনুমান করা যেতে পারে। এছাড়া ১৫ থেকে ২০ সপ্তাহের মধ্যে Amniocentesis পদ্ধতিতে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করা যায়।

গর্ভধারণের ২০ সপ্তাহের পর গর্ভপাত জরুরি হয়ে পড়লে?

অনেক সময় গর্ভধারণের ২০ সপ্তাহ পরেও ভ্রূণে কোনওপ্রকার অস্বাভাবিকতা বা মায়ের জীবনের ঝুঁকি দেখা দিতে পারে। এছাড়াও, নাবালিকা ধর্ষণের ক্ষেত্রে, যখন মেয়েটির শরীরে গর্ভধারণের উপসর্গগুলি প্রকাশ পায়, তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনেক দেরি হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে, ২০ সপ্তাহ অতিক্রম করে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তখন এই আইন বলে, গর্ভপাতের জন্য সেই মাকে আদালতের অনুমোদন আদায় করতে হবে। তবে এমন অনেক মামলায় দেখা গিয়েছে, পরিবার চাইলেও, আদালত গর্ভপাত করবার অনুমতি দেয়নি। এই গুরুতর বিষয়টির সঠিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আইনটি নিঃসন্দেহে ব্যর্থ!

তাহলে উপায় কী?

বর্তমানে ডাক্তারেরা বলছেন, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কারণে গর্ভধারণের ২৪ সপ্তাহ পর্যন্ত গর্ভপাত করা সম্পূর্ণ নিরাপদ। অনেক ডাক্তার আবার বলেন, পরিস্থিতি বিবেচনায় গর্ভধারণের ২৪ সপ্তাহের পরেও গর্ভপাত নিরাপদ। আইন প্রণেতাদের এই বিষয়গুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে এবং আজকের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে প্রয়োজনীয় আইনি সংশোধন করতে হবে। অনেক ডাক্তার আবার বলেন, যেহেতু গর্ভপাত একটি চিকিৎসা সংক্রান্ত এবং ব্যক্তিগত সমস্যা, গর্ভধারণের কোনও পর্যায়ে গর্ভপাত করা উচিৎ তা সম্পূর্ণরূপে ডাক্তারের বিবেচনার ভিত্তিতে স্থির করা হোক, আইনের ভিত্তিতে নয়। তাই কঠোরভাবে সময়সীমা জারি করার পরিবর্তে একটু মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা জরুরি।

শেষকথা

চিকিৎসাগত কারণে গর্ভপাত আইন প্রবর্তনের পর প্রায় ৪৮ বছর অতিক্রান্ত, তবুও গর্ভপাত বিষয়টি আজও আমাদের দেশে একটি বিতর্কিত ও নিষিদ্ধ বিষয় হয়ে রয়ে গিয়েছে। প্রায় অর্ধ-শতাব্দী বয়সী এই আইনটি সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে উদারনৈতিক আইনি প্রচেষ্টা, কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, তা এখনও ত্রুটিমুক্ত নয়। Abortion Assessment Project (২০০০ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ভারতে গর্ভপাতের ওপর সর্বাধিক বিস্তৃত গবেষণাগুলির মধ্যে অন্যতম) অনুসারে, ভারতের মোট গর্ভপাতের ৫৬ শতাংশ ছিল অনিরাপদ! পরিসংখ্যানগতভাবে, ৬৪ লক্ষ বার্ষিক গর্ভপাতের মধ্যে ৩৬ লক্ষ অসুরক্ষিত ছিল! আমাদের দেশের মাতৃমৃত্যুর মধ্যে ১৩ শতাংশ মৃত্যুই ঘটেছে এই অনিরাপদ গর্ভপাতের কারণে! গর্ভপাত বৈধকরণের সাড়ে চার দশক পরেও, ভারতের দরিদ্র মহিলারা নিরাপদ গর্ভপাত পরিষেবাগুলি থেকে বহুদূরে অবস্থান করেন। অর্থাৎ জনকল্যাণকর আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হওয়া সত্ত্বেও, চিকিৎসাগত কারণে গর্ভপাত আইন বেশিরভাগ ভারতীয় নারীর, বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্রদের, নিরাপদ গর্ভপাতের অধিকারকে বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৭১ সালে যখন এই আইন প্রণয়ন করা হয়, তখন ভারতীয় নারীদের যৌনতা, উর্বরতা এবং প্রজনন নিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি ছিল না, যা আজ অনেকটাই সামাজিক-আইনি স্তরে স্বীকৃত। সুতরাং তখনকার এবং এখনকার গর্ভপাত সম্পর্কিত ধারণার আদর্শগত ভিত্তিতে আমূল পার্থক্য রয়েছে। তাই নারীর নিরাপদ গর্ভপাতের অধিকারকে শক্তিশালী করে তুলতে অবিলম্বে এই আইনে সংশোধন আনা জরুরি।

যে ডুয়ার্স লেপ্টে আছে ওড়নার মত সুখী সুখী অতীতের বুকে

দেবপ্রিয়া সরকার

ফি বছর বর্ষায় ছ' সাত দিন নর্দমা ছাপিয়ে রাস্তা ডুবিয়ে দিত বৃষ্টির জল। কখনও কখনও দুকূল ভাসিয়ে হানা দিত করলাও। আর রাস্তায় জল ওঠা মানেই সেদিন আমাদের অঘোষিত ছুটি। স্কুল যাওয়া নেই, পড়াশুনো বন্ধ। ড্রয়িং রুমের জানালার পাশে বসে সারাদিন চলত লোকজনের ছপাৎ ছপাৎ শব্দে জল পাড়িয়ে যাবার দৃশ্য উপভোগ, আর পুরনো খাতার পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নৌকা বানানো। যেদিন ভাগ্য ভাল থাকত সেদিন গলিতে ঢুকে পড়ত কোনও বাস অথবা ট্রাক।

'মেয়েবেলা' শব্দটা নিয়ে অনেককেই দেখি ভুরু কোঁচকাতে। তাদের ধারণা, শব্দটার মধ্যে মিশে আছে কেমন একটা ফেমিনিস্ট ফেমিনিস্ট গন্ধ! কিন্তু আমি 'মেয়েবেলা' কে সম্পূর্ণ সমর্থন করি এবং টেবিল চাপড়ে বলি, ছেলেদের ছোটবেলা যদি ছেলেবেলা হয়, তাহলে মেয়েদের ছোটবেলাও আলবাত মেয়েবেলা!

আমার এই মেয়েবেলা এবং তার পরবর্তী পর্যায়, সবটা জুড়েই আছে প্রাণের শহর জলপাইগুড়ি আর সহজ, সবুজ উত্তরবাংলা। যদিও আমার বাবা এবং মা কেউই জন্মসূত্রে উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা নন, তবুও এই ভূখণ্ডের প্রতি নাড়ির টান অনুভব করে আসছি সেই ছোটবেলা থেকেই। দেশভাগের সময় ছিন্নমূল হয়ে যেসব মানুষরা পূর্ববঙ্গ থেকে চলে এসেছিলেন এপারে, তাদের মধ্যে ছিলেন আমার ঠাকুরদাদাও। বসত গড়েছিলেন হাওড়ার সালকিয়ায়। সেখানেই জন্ম আমার বাবা-কাকার। কোলন ক্যান্সারে খুব কম বয়সে মৃত্যু হয়েছিল আমার ঠাকুমার। তার কয়েক বছর পর মারা যান ঠাকুরদাও। সেই কাঁচা বয়সে মা-বাবাকে হারিয়ে আমার বাবা আর কাকা চলে আসেন জলপাইগুড়ি, মামা-মাসিদের আশ্রয়ে।

লালমাটির দেশ বীরভূমের এক সম্পন্ন জমিদার পরিবারের মেয়ে, আমার মা। এক অদ্ভুত ঘটনা পরম্পরায় বাবার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল মায়ের। আমার বাবা ছিলেন ঢাকার বাঙাল আর মা নিখাদ ঘটি। তাই ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের চিরকালীন তরজা কান পাতলেই শোনা যেত আমাদের বাড়ির আনাচেকানাচে।

জলপাইগুড়ি শহরের সব থেকে নিচু এলাকা বলে যে পাড়াগুলো পরিচিত তার মধ্যে একটাতে ছিল আমাদের বাড়ি। ফি বছর বর্ষায় ছ' সাত দিন নর্দমা ছাপিয়ে রাস্তা ডুবিয়ে দিত বৃষ্টির জল। কখনও কখনও দুকূল ভাসিয়ে হানা দিত করলাও। আর রাস্তায় জল ওঠা মানেই সেদিন আমাদের অঘোষিত ছুটি। স্কুল যাওয়া নেই, পড়াশুনো বন্ধ। ড্রয়িং রুমের জানালার পাশে বসে সারাদিন চলত লোকজনের ছপাৎ ছপাৎ শব্দে জল পাড়িয়ে যাবার দৃশ্য উপভোগ, আর পুরনো খাতার পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নৌকা বানানো। যেদিন ভাগ্য ভাল থাকত সেদিন গলিতে ঢুকে পড়ত কোনও বাস অথবা ট্রাক। হঠাৎই রাস্তার অবরুদ্ধ জলে দেখা যেত স্রোতের দামালপনা। আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠতাম আমরা। উফ! সে এক অবর্ণনীয় খুশির স্বাদ, যে স্বাদের কখনও কোনও ভাগ হয় না।

কাকার দুই ছেলে আর আমরা দুই ভাইবোন মিলে মোট চারটে চুনোপুঁটি ছিলাম বাড়িতে। আমি একা মেয়ে, বরাবরই সংখ্যালঘু। পাড়াতেও সমবয়সী মেয়ে তেমন কেউ ছিল না। তাই দাদাভাইয়ের বন্ধুদের সঙ্গেই বেশি ভাব ছিল আমার। ওদের সঙ্গে কালীপুজোর পাহাড় বানানো, পিকনিকে মেতে থাকতাম আমি। কানামাছি, লুকোচুরি, কুমিরডাঙ্গা খেলাতেও যোগ দিতাম। কিন্তু সব সময় থাকতে হত দুধভাত হয়ে। মানে ওই লেস ইম্পরট্যান্ট মেম্বার আর কী! অধির আগ্রহে অপেক্ষা করতাম, কবে দুধভাত থেকে মাছভাতে উত্তরণ ঘটবে আমার! কিন্তু সে অপেক্ষা কখনওই শেষ হয়নি। কারণ ততদিনে শৈশব পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছি কৈশোরে। সমাজের অদৃশ্য এক সীমারেখায় আটকে গিয়েছে বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে আমার অবাধ মেলামেশার সেই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণটা।

তিস্তার গা ঘেঁষে থাকা শহর জলপাইগুড়ির বাইরে যে প্রকৃতি তার এক মায়াময় সৌন্দর্য বিছিয়ে রেখেছে তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল কাকার হাত ধরে। কন্ট্রাক্টরি ব্যবসার পাশাপাশি কাকার ছিল দুটো জিপগাড়ি। একটা সাদা-নীল রঙের আর একটা জংলা সবুজ, অনেকটা মিলিটারিদের জিপের মত দেখতে। সেগুলো শহরের কিছু অফিসে ভাড়া খাটত। শীতকাল এলেই ছুটির দিনে দেখা পাওয়া যেত তাদের মধ্যে কোনও একটির। বাড়ি থেকে মাংস, ভাত রান্না করে টিফিন বক্সে ভরে সপরিবারে কাকা বেরিয়ে পড়ত কখনও সেবক, কালিঝোরা তো কখনও আবার ডুয়ার্সের দিকে। সেসব যাত্রা থেকে কখনই বাদ পড়তাম না আমি আর দাদাভাই।

ডায়না রিভার বেড অথবা মূর্তি নদীর পাড়ে সারাদিন হুটোপাটির পর যখন সন্ধে নাগাদ চাপড়ামারি বা গরুমারা জঙ্গলের পথ দিয়ে ফিরতাম তখন কাকা শোনাত জঙ্গলের পথে দেখা হাতি, বাইসনের গল্প। জংলি জন্তুদের চোখের সামনে হঠাৎ দেখতে পাওয়ার বাসনা আর চোরা উত্তেজনা নিয়ে তাকিয়ে থাকতাম জানালার বাইরে।

২০০০ সালের এক গ্রীষ্মের দুপুরে আচমকাই সেরিব্রাল স্ট্রোক ছিনিয়ে নিয়ে যায় আমার কাকাকে। সেই সঙ্গে চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যায় আমাদের সেই জিপগাড়ি চড়ে ডুয়ার্স ভ্রমণ। এরপরের বেশ কয়েক বছর বহু চড়াই উৎরাই এসেছে জীবনে। নিত্য দিনের প্রবাহপথে জমতে থাকা উপলের তলায় কোথায় যেন চাপা পড়ে গিয়েছে সেসব সোনালি দিনগুলো।

কিন্তু আমি ডুয়ার্সকে ভুলে থাকলেও সে বোধহয় আমাকে ভুলতে পারেনি। তাই তো সাত বছর পর আবার ডেকে নেয় তার কাছে। আজও স্পষ্ট মনে আছে সেই সোনারোদ ঝরা শরৎকালের সকালটার কথা। মাথার ওপর চালসার ঝকঝকে নীল আকাশকে সাক্ষী রেখে, রাস্তার পাশে সবুজ চা-বাগানের মুগ্ধতাকে সঙ্গী করে, দুরু দুরু বুকে স্কুল সার্ভিস কমিশনের দেওয়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে নিয়ে পা রেখেছিলাম নতুন এক জীবনে।

প্রায় চার বছর ধরে ডুয়ার্স প্রকৃতি আর তার রূপ-রস-গন্ধকে উপভোগ করেছি পরতে পরতে। অনুভব করেছি ছোটবেলার সেই গাড়ির জানালা দিয়ে দেখা ছবির মত ডুয়ার্স আর রক্তমাংসের ডুয়ার্সের মধ্যে ঠিক কতটা পার্থক্য। বন্ধ অথবা ধুঁকতে থাকা বাগানের দারিদ্র ক্লিষ্ট মানুষদের যেমন দেখেছি, তেমনই চাক্ষুষ করেছি অবরোধ, আন্দোলনে ক্ষত বিক্ষত ডুয়ার্সের রূপ।

প্রকৃতি ও প্রেম পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। যেখানে প্রকৃতি এমন অবাধে ঢেলে দিয়েছে তার রূপলাবণ্যকে সেখানে প্রেম কি না এসে পারে? হয়ত সেই জন্যেই এই নিত্য ডুয়ার্স যাত্রার পথেই ধরা দিয়েছিলাম প্রেমের কাছে। বাঁধা পড়েছিলাম দাম্পত্য নামক চিরায়ত সামাজিক বন্ধনে।

কিন্তু চলমানতাই তো জীবনের ধর্ম। সে কখনও এক জায়গায় থেমে থাকে না। আমারও থাকেনি। বদলে গিয়েছে কর্মক্ষেত্র। এখন হয়ত প্রত্যেকদিন সকালে আর কাঁধে ব্যাগ নিয়ে ডুয়ার্সগামী বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকি না। তবুও মূর্তি, কুর্তি, নেওড়া, টিয়াবন লেপটে আছে ওড়নার মত আমার সুখী সুখী অতীতের বুকে। যতই আমি তাদের মিনিমাইজ করে এক কোণে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করি না কেন, সুযোগ পেলেই তারা থাবা বসায় আমার ঘটমান বর্তমানে। তাই তো বারবার ছুটে যাই ভালবাসার সেই ডুয়ার্সের কাছে। কষ্ট হয়, যখন দেখি কংক্রিটের জঙ্গল একটু একটু করে গিলে ফেলছে প্রকৃতিকে, কৃত্রিমতার ঠেলায় উঠছে নাভিশ্বাস! খেয়ালি মনের ইশারায় তাই হয়ত গাড়ির দরজা খুলে নেমে দাঁড়াই জঙ্গলের পথে আর বুকে ভরে নিই সেই চেনা বুনো গন্ধটাকে। কী জানি একদিন হয়ত সেও হারিয়ে যাবে কালের প্রবাহে, আমার হারিয়ে যাওয়া 'মেয়েবেলা'রই মত।

দীপলক্ষ্মী রাজকন্যা ললিতা

শাঁওলি দে

শ্রীমতী ডুয়ার্স

ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন শাস্ত্র ও আচার আচরণ কিম্বা কর্মপদ্ধতির মধ্যে দীপদানের একটা আলাদাই মাহাত্ম্য আছে। তাছাড়াও আমরা সকলেই এটাও জানি, দেবালয়ে যদি আমরা প্রদীপ জ্বালাই তবে আমাদের যেমন ভক্তিভাব জন্মায় তেমনই মুক্তিলাভও হয়। অগ্নিপুরাণে বলা হয়, একবছর ধরে টানা দেবালয়ে ও কোনও ব্রাহ্মণ ঘরে দীপদান করলে সর্বসিদ্ধিলাভ হয়। সেজন্যই হিন্দুরা প্রতি কার্তিকমাসে দীপদান করি, যার প্রধান উদ্দেশ্য স্বর্গলোকে যাওয়া।

অগ্নিপুরাণে এই দীপদান নিয়ে একটি চমৎকার গল্প আছে। পুরাণের অন্যান্য নানা কাহিনির মত এই দীপদানের গল্প ততটা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি কোনও এক অজানা কারণে। এই সংখ্যায় রইল সেই কাহিনিরই কথা।

বিদর্ভ রাজকন্যা ছিলেন ললিতা। সুন্দরী, গুণবতী এই ললিতার বিয়ে হয়েছিল চারুধর্মা নামে এক রাজার সঙ্গে। রাজার ছিল একশ পত্নী, তবু রাজা চারুধর্মা ললিতাকেই সবচাইতে বেশি পছন্দ করতেন। এককথায় পতিপ্রেমে, সোহাগে সৌভাগ্যবতী ছিল ললিতা। রাজার অন্যান্য পত্নীরা এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেন, ভাবতেন বিদর্ভ রাজকন্যার এই সৌভাগ্যের কারণ কী? তারাও তো কম সুন্দরী বা গুণবতী নয়! তবে? কী এমন কারণ যার জন্য চারুধর্মা এত পছন্দ করেন তাঁর এই একশ একতম পত্নী ললিতাকে!

একদিন আর থাকতে না পেরে তারা সবাই মিলে ললিতাকে জিজ্ঞেস করেই ফেললেন যে কী এমন কারণ যে ওঁরা একশজন মিলেও রাজাকে তুষ্ট করতে সক্ষম হন না, অথচ ললিতা রাজার এত প্রিয় হয়ে উঠেছেন?

মৃদু হাসলেন রাজপ্রিয়া ললিতা। তারপর ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, 'আমি আমার পূর্বজন্মের পুণ্যফলে এই সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছি। রাজরানী হয়েও আমি সর্বদাই সেই পুণ্যফলদায়ক কর্মকে বিস্মৃত হয়নি।'

এই কথা শুনে স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য পত্নীরা কৌতুহলী হলেন, প্রশ্ন করলেন, কী সেই পুণ্যকর্ম, তাঁরাও সেটা জানতে আগ্রহী এবং সেই কাজ করে পুণ্যার্জন করতে ইচ্ছুক।

ললিতা তখন তাঁর একশত সপত্নীকে বলতে লাগলেন নিজের পূর্বজন্মের গল্প। অনেক অনেক বছর আগে সৌবীর দেশে মৈত্রেয় নামে এক রাজা ছিলেন। মৈত্রেয়রাজের ছিল এক প্রিয়তমা কন্যা। সেই কন্যা আর কেউ না, ললিতা নিজেই। মৈত্রেয়রাজ একবার দেবিকা নদীর তীরে এক বিরাট বিষ্ণুমন্দির স্থাপন করান। মন্দির প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর কোনও এক কার্তিকমাসে রাজা তাঁর এক রাজপুরোহিতকে সেই মন্দিরে পাঠালেন এবং সেই সঙ্গে এই আদেশও দিলেন যে, সেই রাজপুরোহিত যেন মন্দিরে গিয়ে দীপদান করেন, অর্থ্যাৎ প্রদীপ জ্বালান। রাজ পুরোহিত সেইমতো কাজটি করলেন ঠিকই, কিন্তু তা ঠিকভাবে সম্পন্ন হল না। রাজপুরোহিত দীপদান করে মন্দির ত্যাগ করামাত্র মন্দিরেই অবস্থিত একটি ছোট ইঁদুর বিড়ালের ভয়ে পালাতে গেল ও প্রদীপের ওপর পড়ামাত্র তা নিভে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মন্দিরটি অন্ধকার হয়ে গেল। এর ফল ঘটল মারাত্মক। দেবতা রাজার ওপর রুষ্ট হলেন, তাঁর অভিশাপে মৈত্রেয়রাজের আদরের কন্যার মৃত্যু হল।

এই কাহিনি শেষ করে ললিতা সবাইকে বললেন, সেই হতভাগ্য রাজকন্যাই এই জন্মে ললিতারূপে জন্মগ্রহণ করে। রাজা যেহেতু শুভ উদ্দেশ্যে দীপদান করতে চেয়েছিলেন, তাই এই জন্মে ললিতা জাতিস্মররূপে জন্মগ্রহণ করে। ললিতার পূর্বজন্মের সবকথা মনে থাকায় এই ললিতাজন্মে সে প্রতিদিন দেবতার উদ্দেশে দীপদান করে।

এটা বিশ্বাস করা হয় যে, দীপ মানে লক্ষ্মী। কোনও কোনও বিশেষ তিথিতে দীপদান করলে স্বর্গসুখ লাভ হয়, দীপ চুরি করলে জন্ম হয় মূক ও বধির হিসেবে, নরকেও যেতে হয় মৃত্যুর পর। প্রাচীন বিশ্বাস মতে, জগতে যতগুলি ব্রত আছে তাদের মধ্যে দীপদান হল শ্রেষ্ঠ ব্রত।

ললিতার কাছে এই দীপদানের সুফলের গল্প শুনে রাজা চারুধর্মার অন্যান্য একশ পত্নী প্রতিদিন দীপদান করতে থাকে, সারাজীবন দেবতার সামনে ভক্তিসহকারে দীপপ্রদান করে মৃত্যুর পর স্বর্গের রাস্তা সুগম করে।

আমরা জেনে না জেনে অনেকেই প্রায় প্রতিদিন তো বটেই কেউ কেউ বিশেষ কোনও কোনও দিনে অথবা কার্তিকমাসে দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রদীপদান করে থাকি। কী জানি এভাবেই আমরা স্বর্গের পথটা একটু হলেই সুগম করতে পারি কিনা!

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch (Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super Deluxe (Non AC	Rs. 650	900
Deluxe AC	Rs. 990	1200
Super Deluxe AC	Rs. 1100	1300
VIP Deluxe AC	Rs. 2000	2000
Suite	Rs. 3000	3000
VIP Suite	Rs. 3500	3500
Extra Occupancy (N-AC)	Rs. 100	--
Extra Occupancy (SC)	Rs. 200	--

N.B. *Tax as per applicable*

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar
Tel. No. +91 9735526252, (03582) 227885/231710
Email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubrajcoochbehar.com

বড় গল্প

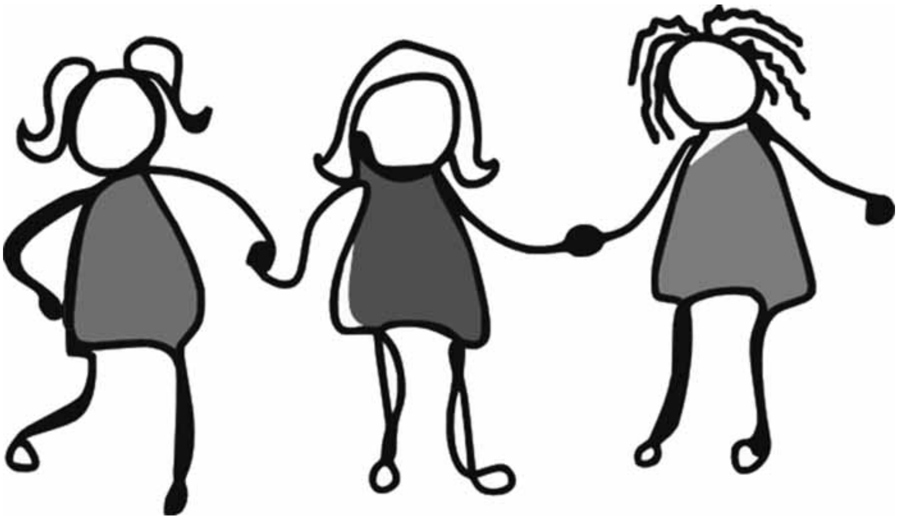

নীল বাঘ

মনোনীতা চক্রবর্তী

কাল রাত থেকেই শুরু হয়ে গেছে বিন্দি আর রাজের ঐতিহাসিক পালা। এখনও চলছেই। প্রতিবার এই একই ঝামেলা। মনে-মনে ভাবছিলেন বসুন্ধরা বোস। আট বছরের নাতনি দেখা মাঝে মাঝেই এসে ঠাম্মার কোলে গুটিয়ে যাচ্ছে। তার বাবি-মামণির ঘরতো নয়, যেন যুদ্ধক্ষেত্র। ওদের এমন অশান্তি হলেই দেখা ঠাম্মার বুকে আশ্রয় খোঁজে। বসুন্ধরার দেওয়া নাম দেখা। ওঁর রুচির তারিফ না-করে কেউ পারবেই না। শুধু রাজের বন্ধুদের নয়, ওর কলিগদেরও নয়, বিন্দির বন্ধুদেরও ভারী পছন্দ বসুন্ধরাকে। শুধু কি তাই, দেখার বন্ধুদেরও খুব প্রিয় ঠাম্মা। আভিজাত্য যেন পরতে পরতে। যেমন রান্না, তেমন খাবার পরিবেশনেও অসামান্য আর্ট। ঘরের দেওয়ালে ওরলি— ওঁরই তুলিটান। এক একটা হাতেবোনা সোয়েটার, শাল দেখলে বোঝা যায় যে কী দুরন্ত সেসব কাজ! অসম্ভব মগ্নতা না থাকলে কিছুতেই সম্ভব নয়। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা বসুন্ধরা। সারা মাথায় একটিও কালো চুল নেই। তাঁর গম-রঙের কপালে খুব কাছ থেকে দ্যাখা নক্ষত্রের মত একটা মেরুন টিপ পাঁচ-তিনের বসুন্ধরাকে যেন আরও জ্যোতির্ময়ী করে তোলে। অদ্ভুত এক প্রসন্নতা ছেয়ে থাকে ওঁর চারদিকে। যদিও দুপুরে খাবার পর ছড়িয়ে দেয়া বরফ-কুচির মত চুল পিঠে মেলে, পেপার বা না-পড়া লিটল ম্যাগাজিন পড়া ওঁর কাজ। কিন্তু আজ আর তার জো নেই। দেখাকে সামলাতেই ব্যস্ত। কিন্তু এবার অন্তত ভেতরে ঢুকতেই হবে। আর উপায় নেই। ভাবতে ভাবতেই ওদের ঘরে গিয়ে দরজায় নক। একবার দু'বার তিনবার। তারপর, দরজা খুলতেই বেশ গম্ভীর গলায় বসুন্ধরা ছেলেকে বলেন— কী হচ্ছে বাবু! দিস ইস টু মাচ ! তোরা কি চুপ করবি? কাল রাত থেকে শুরু করেছিস। আর কত? কোথাও একটা যাবার প্ল্যান হলেই তোদের এই চিৎকার চেঁচামিচি... বাচ্চাটার কথা ভাবিস?

অদ্ভুত এক ব্যাপার কিন্তু এর একটি কথাও বসুন্ধরা চড়া সুরে বলেন নি রাজ-বিন্দিকে। অথচ ওরা কী অদ্ভুতভাবে থেমে গেল। মাথা নীচু করে বিন্দি বলল, স্যরি, মা...

ঘর থেকে বেরোতে-বেরোতেই বসুন্ধরা বললেন, টেবিলে এসো, খাবার দিচ্ছি।

বিন্দি-রাজ দু'জনেই ওদের ছানাকাটা অবস্থাটা কাটিয়ে নেয় বসুন্ধরার হাতের আলুর দম আর তিনকাঁটা মাছের চচ্চড়ি আর লাউ-সিম-ডাটা দেওয়া কলাই ডাল খেতে-খেতেই।

এক পৃথিবী বিস্ময় চোখে-মুখে নিয়ে দেখা ঠাম্মাকে কানে-কানে বলে, ও ঠাম্মা, তুমি আগে কেন ওদের বকোনি? তুমি বকতেই বাবি-মামণি কেমন সুন্দর ভাব করে নিল, দেখলে?

সত্যিই তো দিদিভাই! ঠিকই বলেছ কিন্তু আগেই বকে দিলে পারতাম।

খেতে খেতেই বিন্দি রাজের দিকে তাকিয়ে বলে, আমি জানি, কেন মা আমাদের আগে বলেন নি।

স্যালাড মুখে নিতে-নিতেই রাজ বলে, তুমি তো জানবেই ম্যাম। আমার মা আমার কম, তোমারই বেশি হয়ে উঠেছেন দিন দিন।

হিংসুট একটা! এটা এমনি-এমনি হয় না মশাই, রীতিমত অর্জন করতে হয়। বলেই হেসে ওঠে বিন্দি। যেন রাজ্য জয়-সুখ! জয় তো একটা বটেই। এতে বিন্দু ভুলও নেই।

ঘরে বসুন্ধরা ঢুকতেই রাজ মাকে বলে ওঠে, আচ্ছা মা, তুমি যে আগে মাঠে বাঁশিটা বাজালে না, কোনও কারণ আছে না শুধু শুধুই?

মা ছেলের দিকে হাসিমুখে তাকায় কিন্তু কিছু বলে না।

এবার রাজ ভাবল জয় নিশ্চিতই ছিল, শুধু একবার বাজিয়ে নেওয়া আর কী। সরাসরি বিন্দিকে বলেই ফেলল, দেখলে তো মদমোয়াজেল কোনও কারণ-বারণ-টারন নেই। কিচ্ছু নেই। ডোন্ট ওভারথিঙ্ক!

চোখের পাশে তখনও লেয়ার-কাটচুলের হরকত। এর মাঝেই চোখ ঠিক ঝলকে ওঠে। বাঁকা-ভ্রূ রেখে যায় চ্যালেঞ্জ। অগত্যা, বসুন্ধরা না চাইলেও ঢুকেই পড়তে হয় ওদের মধ্যে।

রাজের দিকে তাকিয়ে বলেন, বিন্দি ঠিক চেনে ওর মা-কে... ও ঠিকই বলেছে বাবু।

গ্রেট! এবার দয়া করে বলো তো মাতাশ্রী...

কারণ আর কিছুই নয়। আসলে কখনও-কখনও এমন ঝামেলা হওয়াটা নিজেদের মধ্যে খুব জরুরি। স্বাস্থ্যকরও। এতে নিজেদের বন্ডিংটা আরও মজবুত হয়!

বাব্বা! পারও বটে মা!

বাবি-মামণির খাওয়া শেষ হতেই দেখা ঠাম্মার কাছ থেকে সোজা তাদের কাছে। আজ সন্ধেতে তো ডোরাদের আসার কথা। কিন্তু যতক্ষণ-না আসে আর কেউ না হলেও দেখা কিন্তু খুব উদ্বিগ্ন! ওরা যে খুব ভাল বন্ধু! একনাগাড়ে বাবির কাছে ভাঙা-রেকর্ডের মত বাজাতেই থাকে, ডোরারা কখন আসবে!

ডোরা অমলিনের মেয়ে। অমলিন সেনগুপ্ত। মানে রাজের ছোটবেলার বন্ধু। ওর স্ত্রী মেঘনা। ওরা দু-জনেই অসাধারণ সেতার বাজায়। ডোরাকে সেতার বাজাতে দেখে দেখারও সেতার বাজানোর ইচ্ছে হয়েছিল বলে বসুন্ধরার কথায় রাজ-বিন্দি দেখাকেও ওদের কাছে শিখতে পাঠায়। খুব যত্ন করে মেঘনা ডোরা-দেখাকে একসাথে শেখায়। সেদিন অন্য ক্লাস রাখে না। প্রায় বছর দেড়েক ওরা শিখছে। দু-জনের স্কুল আলাদা হলেও ক্লাস একই। ক্লাস ফোর।

তাজা রজনীগন্ধা আর সবুজ গোলাপ ভাসে রাখতে রাখতে বসুন্ধরা বিন্দিকে বলে, গ্রে লং-স্কার্ট আর ব্ল্যাক সোয়েটারটা পরে নে। আমি ভেপরাইজড মোমটা এখুনি জ্বেলে দিচ্ছি। চুলটাও ভাল করে আঁচড়ে নিস। ঝগড়া করে করে যা চেহারা বানিয়েছিস।

পেছন দিক থেকে বসুন্ধরাকে জাপটে বিন্দি বলে, আমার সোনা মা! এই তোমার ছেলেটাই যত ঝামেলা পাকালো। বলো মা, আমি কত্ত ভাল না?

বলেই বসুন্ধরার ডান গালে আওয়াজ করে জোরে একটা চুমু খেয়ে চলে যায় রেডি হতে। কে বলবে এই দস্যি মেয়ে এ বাড়ির পুত্রবধূ! আনমনেই মোম জ্বালাতে-জ্বালাতে বসুন্ধরা বলে ওঠে, পাগলি একটা! ভাগ্যিস তোকে রাজ ভালোবেসেছিল! নইলে...

আসলে বিন্দি এতটাই ভাল মনের মানুষ, বড় মনের মানুষ যে আজকাল প্রায় চোখেই পড়ে না। চঞ্চল তিস্তা যেন। অসম্ভব ব্যক্তিত্বময়ী! প্রখর বুদ্ধিমত্তার ছাপ রয়েছে তাঁর চেহারায়। শুধু চেহারাতেই বা কেন, সমগ্র জুড়েই বলা ভাল। এত আন্তরিক, এত প্রাণবন্ত সত্যিই ওর তুলনাই হয় না।

এদিকে দেখাও রেডি। আজ ডোরার সাথে সব প্ল্যানিং সেরে নিতে হবে। আসলে, দেখার ঠাম্মাকে ছেড়ে এক রাত্রিও কোথাও থাকতে ইচ্ছেই করে না। তাই, বাইরে ক'দিনের জন্য ঘুরে কাটানোর থেকে একদিনের পিকনিকের ইচ্ছেটাই বেশি। কতদিন পিকনিকেও ওরা যায়নি। কলিং-বেলের আওয়াজ শুনেই এক ছুটে গিয়ে দেখা দরজা খোলে। এতক্ষণে

অপেক্ষার অবসান। ডোরারা এসে গেছে। আজ যেভাবেই হোক পিকনিকের ব্যাপারটা ঠাম্মাকে দিয়ে রাজি করাতেই হবে। এমনই যে সে ভেবেছে এবং বলে রেখেছে, তাও প্রিয় বন্ধু ডোরাকে জানায়। সে-ও বেজায় খুশি। খুব গোপন-গোপন দু'জনে এসে বসুন্ধরাকে আবার মনে করিয়ে দেয়—

—ঠাম্মা, মনে আছে তো? ভুলো না কিন্তু!

—তোমরা নিশ্চিন্তে খেলা করো। আমি চেষ্টা করবই। এত ভেবো না তো!

খুব স্নেহে ওদের কাছে ডেকে দু'জনের হাতে দুটো করে নারকোল-নাড়ু দিয়ে বলেন—

—কিন্তু, আমার কথা যে তোমাদের দু'জনকেই রাখতে হবে তাহলে!

দেখা ও ডোরা একে-অপরের দিকে তাকায়। দুটো চোখ যেন স্থির ছবির মত হয়ে ওঠে মুহূর্তেই। কিন্তু, আর কোনও অপশনও তো নেই। অগত্যা, রাজি না-হয়ে আর উপায় কী!

করুণ মুখে দু'জনেই বলে, কী কথা ঠাম্মা? বলো-না, কী কথা রাখতে হবে? যদি তোমার কথা আমরা রাখি, তবে তুমি রাজি করাবে তো ঠিক?

টোল-পড়া গাল নিয়ে ঠাম্মা তখন বলেন, দেখছি তোমরা আমায় একটুও বিশ্বাস করো না! নাঃ! থাক তবে।

না ঠাম্মা, প্লিজ বলো বলো বলো! আমরা ঠিক কথা রাখবোই। এই তোমার গা-ছুঁয়ে কথা দিলাম...

বলেই দেখা-ডোরা জড়িয়ে ধরে প্রিয় আদরের ঠাম্মাজানকে। খুব আদর আর আবদারে দেখা ঠাম্মাকে 'ঠাম্মাজান' বলেই ডাকে।

ঠাম্মার ঘরের উত্তর দিকের দেওয়ালের সাদা-কালো ছবিটা দেখিয়ে বসুন্ধরা ওদের বললেন, বলো তো ইনি কে? চেনো তো?

দু'জনই অবাক- স্বরে বলে উঠল, ওহঃ! এই কথা! এত্ত সোজা প্রশ্ন! ইনি বিদ্যাসাগর।

দেখা খুব গম্ভীর ভাবে বলল ডোরাকে, বল তো ডোরা, তাঁর পুরো নাম কী?

ডোরা বলে, শ্রী ঈশ্বর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভুল। খুব ভুল বলেছিস তুই।

দুরন্ত আই-কন্টাক্টে বলে দেখা তার বন্ধু ডোরাকে। বলে, শ্রী নয়। বল, পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বিদ্যাসাগর তাঁর উপাধি। তিনি পণ্ডিত ছিলেন তো। অনেক কিছু উনি জানতেন। মায়ের ডাকে একবার জানিস, অজয় নদ সাঁতরে পার হয়েছিলেন তিনি।

ডোরা বলল, জানি তো। তুই কি জানিস ওঁকে সেদিন সবাই কত-কত মেরেছে! টুকরো টুকরো করে দিয়েছে! থুড়ি, মানে ওঁর স্ট্যাচুটাকে! আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল! টিভিতে বারবার দেখাচ্ছিল।

অবাক হয়ে দেখা বলে, জানি না তো। কিন্তু একটা কী যেন ভাঙাভাঙির কথা শুনেছিলাম। ভেবেছিলাম সৈনঝা মাসির তো দোতালা বাড়ি হচ্ছে, তাই ওই ইটভাঙার কথাই। কিন্তু কেন ভাঙল রে?

হতাশ সুরে একমুখ চিন্তা নিয়ে ডোরা বলে, সেটাই তো। মা-এর গানঘরে তো ওঁর ছবি আছে। আরও ছবি আছে। রাজা রামমোহনেরও আছে। রবিঠাকুর, নজরুল আছে। মোট কথা পঞ্চকবির ছবিই আছে। মা তো এঁদেরই কথা বলে, সবসময় বলে। এমনকি রোজ প্রণাম করে কিন্তু!

দু'জনই খুব চিন্তিত! ভারী বিজ্ঞ বিজ্ঞ ভাব দুই কন্যার। ওরা খুব রেগে গেছেযারা বিদ্যাসাগরের স্ট্যাচু ভেঙেছে তাদের ওপর। দেখা তো বেশ উত্তেজিত হয়ে বলেই দিল, আমি যদি পুলিশ হতাম না! সব ক'টা দুষ্টুলোককে যারা একাজ করেছে তাদের গুলি করে মেরেই ফেলতাম। মানে, ওই পায়েই গুলি করে ওদের সব্বাইকে ধরে লকআপে ঢুকিয়ে দিতাম!

ঠিক বলেছিস। ওদের পানিশমেন্ট দেয় নি। বলে ডোরা ফ্যাকাশে মুখে। ওর কথার রেশ ধরেই দেখা বলে, আমরা কিছু করলেই তো কত শাস্তি পাই! আর যারা এত খারাপ কাজ করে তারা কেন পায় না?

ওদের কথা না থামতেই বসুন্ধরা গাইতে শুরু করেন অন্নদাশঙ্করের সেই বিখ্যাত গান— তেলের শিশি ভাঙল বলে খুকুর প'রে রাগ কর, তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো, তার বেলা?

এমনই বসুন্ধরা। কী অপরিসীম হৃদয় ও দক্ষতায় দুটো শিশুকে মাত্র একটি ছবি দেখিয়ে কীভাবে দুটো শিশুর চোখে দেখে নিলেন আগামীর ছবিটা। কী দুরন্ত দৃষ্টিতে তিনি স্পর্শ করলেন ওদের ভাবনা। এটাই

আজ ডোরার সাথে সব প্ল্যানিং সেরে নিতে হবে। আসলে, দেখার ঠাম্মাকে ছেড়ে এক রাত্রিও কোথাও থাকতে ইচ্ছেই করে না। তাই, বাইরে ক'দিনের জন্য ঘুরে কাটানোর থেকে একদিনের পিকনিকের ইচ্ছেটাই বেশি। কতদিন পিকনিকেও ওরা যায়নি। কলিং-বেলের আওয়াজ শুনেই এক ছুটে গিয়ে দেখা দরজা খোলে। এতক্ষণে অপেক্ষার অবসান। ডোরারা এসে গেছে। আজ যেভাবেই হোক পিকনিকের ব্যাপারটা ঠাম্মাকে দিয়ে রাজি করাতেই হবে।

বসুন্ধরা। আর সকলের থেকে একদম আলাদা তিনি। দুটো এ-ফোর পেপার ওদের হাতে দিয়ে বললেন, যা ইচ্ছে এঁকে ফেলো তো দেখি!

বলেই গুন গুন গাইতে গাইতে তিনি বেরিয়ে এলেন ওখান থেকে রান্নাঘরের দিকে।

রাজ-বিন্দির ঘরে তখন আড্ডার হাওয়া। ওরা এলে সত্যিই যে বসুন্ধরার মুখটা খুশিতে ভ'রে ওঠে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বিন্দি কফি করতে এসে দেখে, অলরেডি মা-ই বানিয়ে ফেলেছেন। এমনই বসুন্ধরা।

মা, সে কী! তুমিই তো বানিয়ে ফেললে! আমি তো আসছিলামই।

তুই যা ঘরে। ওদের সাথে কথা বল। আমি কেকটা নিয়েই আসছি।

আচ্ছা মা, অন্তত ট্রে-টা তো দেবে?

উহ! যা তো। কানের মাথা খাস না। এই আমি আসছি।

অগত্যা, বিন্দি আবার ফিরে আসে ঘরে। ঘোরার প্ল্যান, শপিং এসব নিয়ে বেজায় জমে যায় গল্প। তার সাথে মেঘনার প্রিয় আন্টির বানানো কেক আর কফি, এই শীতের সন্ধেতে! সত্যি মেঘনা! অমলিনের যেন খুশি ধরে না। প্রায় কত ঘণ্টা রাজ-বিন্দি মুখ কালো করে চুলোচুলি করার পর ওদের মুখেও এই হাসিটা দ্যাখার অপেক্ষাই যেন বসুন্ধরা করছিল। সেটুকুই তো অর্জন।

এদিকে দেখা-ডোরা ঠাম্মাকে বারবার ডাকছে যেন তাদের আঁকা ছবিটা যেন তাড়াতাড়ি দেখে যায় আর একই সাথে তাদের কথাটা বলা হয়েছে কিনা জানতে। অগত্যা, না-বলে আর উপায় নেই। এবার তো কোনও-না কোনও অজুহাতে কথাটা বলতেই হবে, কফিতে চুমুক দিতে দিতে ভাবতেই, বিন্দির ডাক, ও মা, কোথায় তুমি? কফিটা নিয়ে এসো এ ঘরে।

আসলে, বিন্দিটা এমনই। কক্ষনো বসুন্ধরাকে একা থাকতেই দেয় না পারতপক্ষে। কিন্তু বসুন্ধরা তো বোঝে যে ওদেরও একটা স্পেস দেওয়া খুব জরুরি। কিন্তু এই মেয়ের পাগলামিতে হেরে যায় সে।

বসুন্ধরা ওদের আসরে যোগ দেন। মেঘনার তো সাফ কথা বিন্দির সাথে সুর মিলিয়েই... কোনও কথা শুনব না। আন্টি তুমিও যাচ্ছ আমাদের সাথে সুন্দরবন। যাচ্ছ-যাচ্ছ-যাচ্ছ... তোমাকে ছাড়া আমরা কোথাও নড়ছি না বলে দিলাম।

এরই মাঝে অমলিন বসুন্ধরাকে বলে ওঠে, আন্টি 'মেঘের প'রে মেঘ জমেছে...গানটা গাও না, কতদিন শুনি নি...

অমলিনের কথা শেষ হতে-না-হতেই মেঘনা বলে, সে গান হবে। তার আগে বলো আন্টি তুমি যাচ্ছ... প্লিজ-প্লিজ-প্লিজ

আস্ত পাগলাদের ডেরায় এসে হাজির। মনে মনে ভাবে এই তো বলার মোক্ষম সুযোগ... একটা লম্বা শ্বাস টেনে বলে...

যথা আজ্ঞা! কিন্তু, তার আগে আমার দুটো কথা রাখতে হবে। তবেই আমি যাব।

সবাই মিলে ঘর ফাটিয়ে বলে, রাখব-রাখব-রাখব... সব কথা রাখব।

আগে তোমরা কথাটা শোন। তারপর নয়...

রাজেরও সাফ কথা, আচ্ছা, বলেই ফেলুন মাতে!

বসুন্ধরা বলেন, আজ রাতে বাইরে খেতে যেতে হবে না। এখানেই খাবে তোমরা। আর দুই, আগে একটা পিকনিকের আয়োজন করো। অনেকদিন হয়ে গেল কোনও পিকনিকে যাওয়া হয় নি। তারপর ঘুরতে যাওয়া। আগে পিকনিক পরে সুন্দরবন। রাজি?

ঠাম্মার কথায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বাড়ি মাত করে সায় দেয় দেখা-ডোরা।

ওরাও বলে, আগে পিকনিক-পিকনিক... ইয়ে...কী মজা!

বসুন্ধরার কথায় না-রাজি হয়ে কেউ পারে? সব্বাই রাজি।

এদিকে, ইতিমধ্যে ঠাম্মার কাছে জমা পড়ে দুটো ছবি-আঁকা পৃষ্ঠা। ডোরা এঁকেছে ঘরের দেওয়ালে বিদ্যাসাগরের ছবি। হাতলওয়ালা কাঠের চেয়ারে দুটো হাত রেখে বসে আছেন। এক হাতে একটা বই। যাতে লেখা বর্ণ পরিচয়। বিপরীতে ওর মা। ছবির নীচে লেখা—

"বিদ্যাসাগর দয়ারসাগর বীরসিংহ ধাম।
বিশ্বজোড়া সুখ্যাতি যাঁর, বিশ্বজোড়া নাম।।"

দেখা এঁকেছে রাস্তায় এক গালে হাত রেখে বসে আছেন বিদ্যাসাগর। চোখে জল মুক্তোর মত গড়িয়ে নামছে। চারদিকে খুব ভিড়। বিদ্যাসাগর শুধু আকাশ দেখছেন। আকাশে একটি নারীর মুখ ভাসছে দু'হাত নীচের দিকে বাড়ানো।

এক ঝটকায় থমকে দাঁড় করায় বসুন্ধরাকে। একবার

মনে হয় যে ছবি না-আঁকতে দিলেই পারতেন, পরক্ষণেই ভাবলেন যে তিনি তো কোনও বিষয় ওদের বলে দেন নি। কিন্তু আসলে কি অবচেতনে ওই শিশু দুটোর মনের ভেতরের কথাই জানতে চেয়েছিলেন বা সেই চেষ্টাই করেছিলেন? কিন্তু এত কেন ভাবছেন তিনি, ভাবছেন সেটাই। বরং এতো খুব সজল-আনন্দেরও!

হঠাৎ বসুন্ধরার সমস্ত স্তব্ধতা ঝনঝন করে ভেঙে দিয়ে দেখা আর ডোরা ঠাম্মাকে কোমরে জড়িয়ে এক সঙ্গে চেঁচিয়ে বলে—

কারটা বেশি ভাল হয়েছে ঠাম্মা?

ঠাম্মাও দু'হাতে ওদের পিঠ-কোমর জড়িয়ে বলেন, খুব ভাল হয়েছে দু'জনেরটাই। আমি খুব খুশি!

দুটো ছবিই বসুন্ধরা ওদের দু'জনকেই দেখিয়ে বলেন—

আচ্ছা, দুটো ছবির মধ্যে কোন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তোমাদের দেখে মন ভাল লাগছে?

একই সঙ্গে দেখা-ডোরা বলে, যেখানে বিদ্যাসাগরের চোখে জল নেই, সেই বিদ্যাসাগরকেই।

ডোরা খুব খুশি-খুশি গলায় জানায় যে তার বিদ্যাসাগরের চোখে জল নেই।

দেখাও ডোরাকে বলে, তুই ওই স্ট্যাচু ভাঙার কথা বলেছিলি, তাই ভাবলাম কত কষ্ট হচ্ছে তাঁর ! তাই তাঁর মায়ের দিকে তাকিয়ে কাঁদছেন!

ওদের মধ্যে নাক গলিয়েই বসুন্ধরা বলেন, তাই-ই তো আমি ঠিক করেছি যে তোমরা দু'জনেই ফার্স্ট! বলেই নাড়ুর কৌটো থেকে আরও দুটো-দুটো করে নারকোল নাড়ু দেখা-ডোরার হাতে দিয়ে বললেন যে ওরা ওদের পুরস্কারটা ঠিক সময়েই পেয়ে যাবে, এজন্য ওরা যেন কোনও চিন্তা না করে।

এরপর সোজা দক্ষিণ-পূর্বে...

রাতের খাবারের আয়োজন করতে যাবার আগেই বসুন্ধরা বিন্দিকে বলে, তোর্সাদের একবার ডেকে নিস। ওরা তো সুন্দরবন যেতে পারবে না। ঠিক পিকনিকে যেতে পারে। একবার এখুনি ফোন করে ডেকে নে রাজ। আর আসছে কিনা আমায় জানাস আগে। আমি রান্না বসাব।

ঠিক আছে মা। এখুনি করছি। তুমি একটু দাঁড়াও তো।

বলতেই ডায়াল তোর্সাকে। মিনিট কুড়ির মধ্যেই ওরা এসে যাচ্ছে।

তোর্সা চক্রবর্তী। ও রাজের সাথে সেই নার্সারি থেকে পড়ত। খুব ডানপিটে ছিল বরাবরই। এখনও সেই টমবয়-টমবয় ভাবটি রয়েই গেছে। ভাল হাইটের জন্য আলগা একটা অহংকার ছিল ওর। তবে, চোখ দুটো কিন্তু খুব আততায়ীর। খুন হয়ে যেতেই পারে যে কোনও সময়ে যে কেউই! অবশ্য খুন হতে চাইলেই তো আর খুন হওয়া যায় না। খুনিরও তো একটা পছন্দ বলে কথা আছে ! তবে তোর্সা যদি বলেই ফেলে ওর কোনও শিকারকে, নজরের দোষ দিয়ো না। ও নজর কথা শোনে না... তবে বিন্দু ভুলও হবে না! শিকারি সমর্পিত হবে 'ভ'-দিয়ে গড়ে ওঠা যাবতীয় দিয়ে। এ ব্যাপারে কোনও ভুল নেই। মুখও চলে ঝড়ের চেয়েও বেশি। একটি কথাও কারও মাটিতে পড়তে দেয় না। কথায়-কথায় রাগ, অভিমান লেগেই আছে। স্কুটি নিয়ে শহর তোলপাড় করে। বাইরে-বাইরে যতটা রুক্ষ, ভেতরটা ঠিক ততটাই নরম। ঠিক বসুন্ধরার বানানো নারকোল-নাড়ুর মত। বিশুদ্ধ ঝড় বললেও কোনও ভুল নেই। ইদানীং 'অ-কবির পাঠশালা' বলে একটা কবিতা লেখা শেখানোর স্কুল খুলেছে। শহরের অনেক চেনামুখ আসছে নিয়মিত 'অ-কবির পাঠশালায়'। চাইলে কেউ ডিস্টেন্স-এও ক্রাশকোর্স করতেই পারে। তবে, সেখানে ডাউন-পেমেন্টটা রেগুলারদের চেয়ে কিছুটা বেশি। "কখনও কবিতা লেখেন নি তো কী হয়েছে। চোখ বন্ধ করে চলে আসুন আমাদের প্রতিষ্ঠানে। ছ'মাসের মধ্যে ছাপার অক্ষরে দেখবেন আপনার লেখা ঝলমল করছে অসংখ্য পাঠকের সামনে...পড়শির চোখে 'ওনিডা' হয়ে উঠতে আজই আসুন..." হ্যাঁ, এটাই ট্যাগ-লাইন তোর্সার 'অ-কবির পাঠশালা'-র। পারলে মাঝরাতেও চায়ের ঠেক চালু রাখে। একটা উদ্দাম জলোচ্ছ্বাস। সম্প্রতি 'হিপহপ'-এও জয়েন করেছে। নিয়মিত হনুমান-চল্লিশা পড়ে। সেই দমকা-হাওয়াই আর কিছুক্ষণের মধ্যে তুফান হতে চলেছে রাজ-বিন্দির ঘরে। সেই প্রতীক্ষায় সবাই মুখর।

এর মধ্যেই অমলিন গেয়ে ওঠে —'তেরে জ্যায়সা ইয়ার কাহা, তেরা মেরা আফসানা' সাথে-সাথে মেঘনা-বিন্দিও।

'মেঘের পরে মেঘ জমেছে... ' গুনগুন করে তুরন্ত চলে যায় রান্নাঘরে বসুন্ধরার সাথে। পিছে-পিছে দেখা-ডোরাও। বেজায় খুশি ওরা ঠাম্মার ওপর।

একটু পরপরই এসে মাকে দেখে যাওয়া বিন্দির একটা স্বভাব। যথারীতি এখনও তাই।

বসুন্ধরা পেঁয়াজ কাটতে কাটতেই বিন্দিকে বলল, ফোনটা আনতো আমার। তোর মাকে ডায়াল কর আসতে বলি পিকনিকের জন্য।

আচ্ছা, দিচ্ছি দাঁড়াও।

বলেই রিং-করে ধরিয়ে দেয় বসুন্ধরাকে। ওদিক থেকেও সম্মতি মিলে যায়। তার মানে বসুন্ধরাও পাবে প্রিয় সই। কাল খুব ভোরেই ঢুকে যাবে পৃথা। বিন্দির মা। খুব প্রাণ চঞ্চল। একদম মায়ের মতই হয়েছে বিন্দি। তবে মা অনেক বেশি শান্ত। এক্কেবারে ডাকাত রানি এই বিন্দি! সারা পৃথিবী যেন সারাবছর ঝমঝম বৃষ্টি হয়ে ঝরে ওর ভেতর! দিদামা আসাতে দেখাও খুব খুশি। আসলে ইচ্ছে হলেই মেয়ের কাছে আসা বা বসুন্ধরারও ছেলের শাশুড়িকে মাঝে মাঝেই এই ডেকে আনা, এ এক অন্যরকম অনুভূতি। যে-স্যোশাল স্ট্রাকচার মেল-ডোমিনেটেড, সেখানে এমন ছবি সত্যিই বিরল। বসুন্ধরা বলেই এটা সম্ভব। কী চ মৎকার মেলবন্ধন দুই মায়ের ভেতর, দুই পরিবারের ভেতর সত্যিই তা দেখবার মত। অদ্ভুতভাবে এরা কত সহজে ভেঙে ফেলতে পেরেছে স্যোশাল ট্যাবু! পৃথা একটি গেস্ট-হাউজ চালায়। বিন্দির বাবার পারিবারিক অন্য ব্যবসা। বরাবরই নিজের কিছু একটা নিজে করার দুরন্ত ইচ্ছে ছিল ওঁর। তাই মেয়েকেও বারবার ও উৎসাহিত করত নিজের পায়ে দাঁড়াতে। বিন্দিও একটি কর্পোরেট সেক্টরে আছে। যাই হোক, পৃথাও আসছেন আগামীকালের মহামিছিলে সামিল হতে।

ইতিমধ্যে, দেখা-ডোরা এসেছে ঠাম্মার কাজে হেল্প করতে। জোর করে রসুনের খোসা ছাড়াতে বসেছে। এই নরম নরম নখে ব্যথার কথা ভেবে, কতবার বসুন্ধরা ওদের যেতে বলেছে, কিন্তু ওই যে নন্দিনীরা মোটেই কথা শোনার পাত্রী নয়।

এর মধ্যেই তোর্সা হাজির। তোর্সা এসেই আন্টির কাছে আর রুহি যথারীতি দেখা-ডোরার সাথে। যেন ত্রিবেণী সঙ্গম! এতক্ষণে না মনে হচ্ছে কমপ্লিট! ঢুকেই তোর্সা ঘ্যানমালিকের মিউজিক ব্লু-টুথে জুড়ে দিল। এই না হলে ভারত! এই না হলে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত! এর মধ্যেই মেঘনা গলা ছেড়ে ধরে 'মিলে সুর মেরা তুমহারা, তো সুর বনে হামারা..'

এদিকে দেখা-ডোরা-রুহি নানান খেলায় ব্যস্ত। সাথে কাল পিকনিকে কী পরে যাবে সে সব নিয়ে খুব সিরিয়াস আলোচনা। এরই মাঝে দেখা রুহিকে দ্যাখায় ওদের আঁকা ছবি দুটো। এবং ঠাম্মা কী বলেছেন, তাও তারা বলতে ভোলে না। মানে দেখা ও ডোরা। প্রাইজের ব্যাপারটাও আছে, তাও বলে। মন খারাপের গলায় রুহি বলে যে সে তার মায়ের জন্যই আগে আসতে পারে নি।

এর মধ্যেই আবার বিন্দি, মেঘনা আর তোর্সা এসে জানায় পিকনিকের স্পট। গজলডোবা। তবে তার আগে বেঙ্গল সাফারি।

তোমার পছন্দ তো মা?

বিন্দির কথা শেষ না হতেই তোর্সা বলে, আন্টি কাল ব্ল্যাক না ব্লু জিন্স পরব বল তো? ক্রেপ টপটা ডার্ক কপার কিন্তু।

বসুন্ধরার চটপট উত্তর, ব্লু। নে এবার তোরা খেতে বস তো। বাচ্চাদের আমি আগেই অন্য ঘরে বসিয়ে দিয়েছি। অমলিন, রাজকেও ডাক।

ডাকছি। আমি পরে বসছি মা। তুমি কিন্তু এখুনি বসতে বলবেই না কিন্তু!

বলেই বিন্দি ওদের ডেকে আনে। আর বসুন্ধরাকে কিছুটা হেল্প করে। বারণ কি কখনও শোনে এ মেয়ে। বাটার-নান আর চিলি-চিকেন... আর তারপরই বসুন্ধরার হাতে বানানো আইসক্রিম। ফ্লেভার-বাটার স্কচ। বিন্দির খুব প্রিয় বলেই মাঝে মাঝে ঘরেই বানান বসুন্ধরা। যদিও ওরা বাইরে থেকেই এনে বেশি খায়। তবু বিন্দির প্রিয় বলে বসুন্ধরা মাঝে মধ্যেই নিজের হাতে বানান।

সবাই খুব তৃপ্তি করে খেয়ে ওঠে। বসুন্ধরার রান্না বলে কথা! এখনও কী ঋজু-সাবলীল!

সবার ঘরে ফেরার খুব তাড়া। কাল বেরোনোর প্রস্তুতি আছে সবারই। এমন সময় একটা ফোন এল। ব্যালকনি থেকে কথা সেরে ফিরে আসা তোর্সার মুখটার সব জেল্লা যেন মুহূর্তে উবে গেছে। রুহির বন্ধু শবনমের মা-বাবা আর নেই... কার আকসিডেন্ট। একই এপার্টমেন্টে থাকে ওরা। রুহি কিছু একটা আন্দাজ করলেও সবটা বোধহয় বোঝে নি অথবা বুঝেছে কে-জানে...

তখনই রাজ, অমলিনও তোর্সার সাথে বেরিয়ে পড়ে। বাকিরা সব এখানেই। কারও চোখের পাতা পড়ছে না, শবনমের কথা ভেবে...

অনেক কষ্টে অন্তত বিছানা পর্যন্ত দেখা-ডোরা আর রুহিকে আনতে পেরেছেন বসুন্ধরা। পাশের ঘরের ইজিচেয়ারে তখন বসুন্ধরা। রাজের ঘরে বিন্দি আর মেঘনা। কারও মুখে কোনও কথা নেই...

বসুন্ধরার বারবার মনে পড়ে যায় শহর থেকে দূরে একটা গ্যারেজের পাশে রাজকে নিয়ে সেই ভয়ংকর এক অপেক্ষার কথা। শরতের হিম-হিম সে-রাত। এ্যাম্বুলেন্স থামল। বসুন্ধরা তাঁর পছন্দের প্রথম স্বামীকে রজনীগন্ধার মালা দিয়ে, শেষবারের মত তাঁকে জড়িয়ে হাউমাউ করে কাঁদছেন। ছোট্ট রাজ বাইরে রাইকে সান্ত্বনা দিচ্ছে আর বসুন্ধরার দ্বিতীয় স্বামী ওদের নিয়ে এসেছিল এখানে। একটা-দুটো বছর নয়, আঠারোটা বছর ঘর করা আর কুড়ি বছরের দাম্পত্য। তারপর ঘর ভাঙা। আর-একটা শুরুর ভেতর শেষের সংলাপ যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, নিঃস্ব মানুষের মত তেমনই ছিল সেই অন্ধ রাত! আজও বসুন্ধরা রাতের আকাশে নিভৃতে কী-যেন খোঁজে। একা থাকলেই এসব ভিড় করে মাথায়-মনে। এক-একটা মৃত্যু...কী ভয়ঙ্কর লণ্ডভণ্ড

লেখে, যে-লেখা কখনোই থামে না।

রুহি খুব কাঁদছে শবনমের জন্য।

জানিস ও আমার খুব বন্ধু। ওরও কষ্ট ব্যাংকে জমা হল আমার মত।

রুহির কথা শেষ না-হতেই ডোরা বলে, কাঁদিস না রে। পিকনিক আমরা তো পরেও যেতে পারব। কিন্তু তোর মত কষ্ট কেন বললি রে রুহি?

দেখা খুব ভারী গলায় বলে, সব্বার ব্যাংকে কষ্ট আছে রে। আমরা কেউ ভাল নেই। দ্যাখ, আমার ঠাম্মা ইজিচেয়ারে। মন কেমন করলেই ওখানে বসে। তারপর শুধু কাঁদে। আমরা কেউ ঠাম্মাকে ডাকি না, কথা বলি না তখন।

প্রতিটি শিশুর মুখ ক্রমশ বিবর্ণ হচ্ছে! অদ্ভুত এক বিপন্নতা যেন ঘিরে ধরেছে ওদের! হঠাৎ খুব জোর চিৎকার, কান্নার আওয়াজে খুব ভয় পেয়ে যায় ডোরা-রুহি। দেখা ওদের ভয় পেতে বারণ করে। বলে, ওটা উলটোদিকের ফ্ল্যাটে মায়া আন্টির আওয়াজ। এদিকের ঘরটাতেই থাকে। সবসময় আন্টিকে তালা দিয়ে রাখে বাড়ির লোক। আমার সাথে খুব ভাব, জানালা দিয়ে ডেকে-ডেকে কী সুন্দর কথা বলে একেক সময়। তবে, বেশির ভাগ সময়ই কোনও কথাই বলে না কারও সাথে। ঠাম্মা-মা দু'জনেই বলেছে। কোথায় যেন ছিল কিছুদিন। সারাদিন ওই ঘরটাতেই আটকে থাকে। মা বলেছে যে খুব-খুব খারাপ লোকেরা এমন করে দিয়েছে মায়া আন্টিকে। তোরা ভয় পাস না রে। খুব ভালো মায়া আন্টি! আমার খুব কষ্ট হয় আন্টির জন্য!

ডোরা, আবার বলে, আয় আজ আমরা সবাই কার ব্যাংকে কত কষ্ট জমেছে সেগুলো সব বলি। কেউ মিথ্যে বলব না কিন্তু। আচ্ছা কে আগে বলবে?

রুহি আর দেখা বলে তুই। ডোরা বলে, বেশ। যতক্ষণ-না সবার সার্কেল পূরণ হচ্ছে ততক্ষণ কেউ কোনও কথা বলব না। আমার জন্মদিনের দিনই আমার মা ব্রেইনস্ট্রোকে মরে যায়। আমার তখন দু'বছর। খুব হালকা-হালকা মনে পড়ে মাকে। আগে আমাকে যখন কেউ দেখে বলত ধরে স্মিতার মুখ... আমি তখন আমাকে আয়নায় দেখে, মা ভেবে কাচে আমাকেই জড়িয়ে কাঁদতাম। এখনও কাঁদি। সেতারে যখন বাবা দরবারি বাজায় আমি পটি করতে যাবার নাম করে টয়লেটে গিয়ে জল ছেড়ে খুব কাঁদি! মাকে খুব মনে পড়ে। সারা ঘরে একটা ছবিও রাখে নি বাবা। মায়ের কিচ্ছু নেই! আমি খুব ছোটো থাকতেই এই মা আমাকে মানুষ করে। খুব ভালোবাসে। সবার সত্যি মায়েরা যেমন.. ঠিক তেমন। তাই আমার কষ্ট হলেও মাকে একটুও বুঝতেই দিই না। নইলে মা যে কষ্ট পাবে, কাঁদবে!

নে, এবার রুহি বল..।

আমার মা আছে। বাবা নেই। আমার বাবা বেঁচে আছে। এই শহরেই। কিন্তু মাকে ওই লোকটা বিয়ে করে নি। আগে আমাকেও খুব আদর করত। আমিও খুব ভালোবাসতাম। কিন্তু ওই যে আমার বাবা, জানতাম না। একবার অনেক ঝগড়া হয়েছিল আমাদের বাড়ি। তারপর থেকে আর আসে না ওই লোকটা। মা ছাড়া আর আমার কেউ নেই। আমার মা-ই আমার সব। মা-বাবা সব। আমাকে নিয়ে অনেকেই মজা করে। আমি বুঝি। আদর করার নাম করে কাছে ডেকে বাবার নাম জিজ্ঞেস করে, আরও অনেক কিছু জানতে চায়। আমার মাকে অনেক

আমার জন্মদিনের দিনই আমার মা ব্রেইনস্ট্রোকে মরে যায়। আমার তখন দু'বছর। খুব হালকা-হালকা মনে পড়ে মাকে। আগে আমাকে যখন কেউ দেখে বলত ধরে স্মিতার মুখ... আমি তখন আমাকে আয়নায় দেখে, মা ভেবে কাচে আমাকেই জড়িয়ে কাঁদতাম। এখনও কাঁদি। সেতারে যখন বাবা দরবারি বাজায় আমি পটি করতে যাবার নাম করে টয়লেটে গিয়ে জল ছেড়ে খুব কাঁদি!

খারাপ-খারাপ কথা অনেকে বলে। আমি জানি। কিছু-কিছু শুনেওছি। কিন্তু আমার মা আমাকে কক্ষনো কোথাও ছেড়ে যায় না! মায়ের অসুখ করলে আমার খুব ভয় করে! আমি যে সব বুঝি, একটুও মাকে বুঝতেই দিই না... সব সময় ভয় করে মায়ের যদি কিছু হয়... কাউকে-কাউকে এই কথাগুলো কোনওদিন বলি নি... সবার বাবা আছে, বাবার নাম আছে শুধু। আমার বাবার নামের জন্য আমার মাকে বারবার কোর্টে যেতে হয়! আমার ব্যাংকেও অনেক কষ্ট...

নে তুই বল দেখা... কিচ্ছু লুকোবি না কিন্তু...

না না, লুকোব কেন? তোরা তো তবু তোদের মা বা বাবার কাছে থাকিস। তাদের দেখেওছিস। আমি তো সেটুকুও না রে। জানিস, আসলে আমি এই বাড়ির কেউ নই। কেউ নই। বাবি-মামণি আমাকে হোম থেকে নিয়ে এসেছে। যেখানে সব বাবা-মা'র ফেলে দেওয়া বাচ্চারা থাকে, সেখানে আমাকেও ফেলে গিয়েছিল। আসলে আমি অনাথ রে! বাবি-মামণি-ঠাম্মা কোনওদিন বলেনি আমাকে এসব। কোনওদিন বুঝতেও পারি নি যে আমি কেউ নই এবাড়ির। কিন্তু আমি জেনেছিলাম। একবার পাড়ার দু'জন আন্টির কথা শুনে আমার একটা বন্ধু আমাকে একদিন বলেছিল। আমি বিশ্বাস করি নি প্রথমে। কিন্তু একদিন বাবির মোবাইলে গেম খেলতে খেলতে মেসেজ ইনবক্সে একটা এসএমএস পড়ে ফেলেছিলাম। ঠিক করি নি কাজটা, কিন্তু এখন সব জানি। শুধু মনে হয় যদি সত্যি কোনওদিন আমার বাবি-মামণি-ঠাম্মার কাছ থেকে ওরা আমাকে কেড়ে নিয়ে যায়! কী হবে! তার আগে আমি মরেই যাব! আবার মনে হয় কে আমার মা-বাবা, আসলে কে আমি... অন্তত মাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে! আমার পাগল-পাগল লাগে! আমিও এক দৌড়ে বাথরুমে ঢুকে সবকটা কল খুলে জল ছেড়ে দিই। খুব কাঁদি। আমার সব্বাইকে নিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে জানিস। খুব ইচ্ছে করে! আমি কোনওদিন বাবি-মামণিকে বুঝতেই দিই নি যে আমি জানি সবটা! ঠাম্মাকেও না! কিন্তু কে আমি? আমি কে? খুব জানতে ইচ্ছে করে জানিস...

বাইরে অনেক রাত তখন। খানিক দূরে হাসপাতালে বডির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে তোর্সারা। আরও বেশ খানিকটা দূরে বেড়া দিয়ে ঘেরা এক জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় বাঘ। দিনভর সাফারি নামের মানসিক নিপীড়ন, মানুষের হাতে নিয়ন্ত্রিত জীবন, বড় ক্লান্ত দেখায় সে বাঘকে। যন্ত্রণায় কিংবা শুক্লপক্ষের আলোতে বড্ড নীল দেখায় তাকে।

ইজিচেয়ারটায় কেউ নেই। তিনটে বাচ্চা একে অপরকে জড়িয়ে আছে, সবার মাথাগুলো ফলস সিলিংয়ের দিকে একই ভাবে। ঘাড়গুলো পিঠ ছুঁয়ে আছে। তিনটে পিঠ একই ভাবে আরও পেছনে হেলে আছে... ঠিক যেন ত্রিপল্লব! কেউ একটিও কথা বলছে না, ঘরের এপারে-ওপারে যারা... শুধু ঘড়ির কাঁটার টিক টিক...

ধারাবাহিক থ্রিলার।
তিন পর্বে সমাপ্য। পর্ব ১

মরা মৌমাছির চোখ

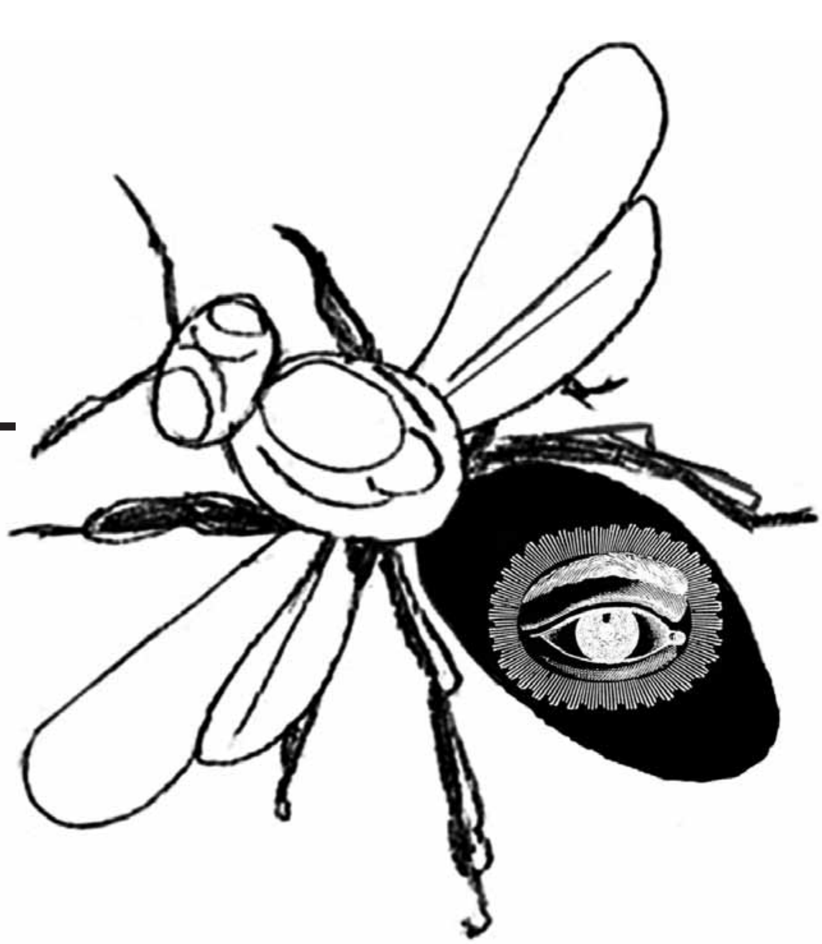

সাগরিকা রায়

মনের অতলে লুকিয়ে থাকে এক নিশাচর প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে। অপেক্ষা করে সময়ের। আসবে সে। প্রেতপুরী থেকে সে আসবে। জরাকে আটকে রেখে জীবনকে উদযাপনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে একদিন সে বোঝে জীবন পুরোটাই মৃত্যুর রসে আবৃত। এক মৃত তার চোখ দিয়ে দেখে হত্যালীলার ছবি।
মরা মৌমাছির চোখ, তেমনই এক রহস্যাবৃত মনের অতলের কাহিনী।

(১)

চোখ বুজে থাকলেও কান জেগে থাকে। কান শুনতে পায় শিশিরের শব্দ। ভোর হওয়ার শব্দ। পাখিরা তখনও জাগেনি, গাছের পাতার হিম ঝরেনি। জবালা বোঝেন ভোর হতে আরও দেরি আছে। এপাশ ওপাশ করলেও ঘুম আসে না। তখন উঠে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার নেই! ওঠেন। উঠে পায়ের ওপর থেকে হালকা রাজস্থানি চাদরটা সরিয়ে দেন। পুবের জানালা খুলে দাঁড়িয়ে শেষ রাতের হিম হিম বাতাসে স্নিগ্ধ হতে চান। সমস্ত শরীর যেন জ্বলে যায় তাঁর! আগুন জ্বলে! সেই তাপে দগ্ধ হতে হতে ভেতরটা কয়লা-কালো। অথচ বাইরের শরীরে স্বর্ণ আভা। দীঘল কালো চোখের মণি অস্বাভাবিক স্থির হয়ে একই জায়গায় নিবদ্ধ হয়ে আছে। কী দেখছেন, বোঝা যাচ্ছে না। হয়ত মনের চোখ খোলা। সেই জন্য বড়মণির চোখ দেখলে মাঝে মাঝে জীবিত মানুষের চোখ বলে মনে হয় না। মনে হয় মরা মৌমাছির চোখ!

কতক্ষণ এভাবে কেটে যায়, নিজেরই খেয়াল থাকে না। তারপরে পেছন ফিরে দাঁড়ান। আধ-অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। তবু তারই মধ্যে মেঝের ওপরে শুয়ে থাকা নীলমের কোমল শরীরটাকে দেখতে পান। বেঁকেচুরে ঘুমিয়ে আছে মেয়েটা।

"নীলম!"

একবার ডেকেই চুপ হয়ে যান। এতেই হবে। নীলম এরপর আর শুয়ে থাকবে না!

"হ্যাঁ বড়মনি। উঠছি।" আধ অন্ধকারে চোখ মেলে তাকিয়ে নীলম বুঝে ফেলে আজও রাত শেষে উঠে পড়েছে বড়মনি। স্থির হয়ে রয়েছিলেন জানালার সামনে। কী ভাবেন উনি? চোখ দেখে মনে হয় ঘোলাটে চোখে কোন দীপ্তি নেই! ভয় হয়। প্রচন্ড ভয় হয় নীলমের।

ঝটিতে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বিছানা তুলে ফেলে নীলম। বড়মনির স্নানের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ঠান্ডা জলে স্নান করবে বড়মনি। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করার অভ্যেস। ততক্ষণে ঘর গুছিয়ে ফেলবে নীলম। বড়মনির পালঙ্ক সাজিয়ে রাখবে। পুজোর উপকরণ গুছিয়ে দেবে। ঠাকুরঘরে! নীলম কিছু কিছু ব্যাপার বুঝতে পারে না। ঠাকুরঘর কথাটা রয়েছে। ঘর রয়েছে। কিন্তু ঠাকুর! কাকে পুজো করে বড়মনি! স্নান সেরেই ঠাকুরঘরে ঢুকবে বড়মনি। বের হতে হতে বেলা বারোটা। সামান্য কিছু খেয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকে। কী করে! নীলমের পর্যন্ত ঘরে ঢোকার অনুমতি নেই! নীলম তখন কিচেনের খবর নেয়। নিজের পার্সোনাল কাজকর্ম সারে। বড়মনির খাস দাসী ছাড়া আর কী পরিচয় ওর!

নীলম বাথরুমে বড়মনির জামা কাপড়, তোয়ালে

রেখে এল।

"তেল আন।" বড়মনির লাল টকটকে চোখদুটো দেখে আগে খুব ভয় হত। এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। প্রায় নিরাবরণ শরীর নিয়ে জলচৌকিতে বসেছে বড়মনি। চুপচুপে করে তেল মাখাল নীলম। অপূর্ব সুন্দরী বললেও যেন কম বলা হয়। বড়মনির শরীরে হাত ছোঁয়াতে শিরশির করে নিজের শরীর। কি রঙ গায়ের! কি ফিগার! মেদহীন তরতরে শরীরে যৌবনের ঢেউ উঠে থমকে গেছে! আর একটি পা এগিয়ে যায়নি! এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে!

"মাথায় তেল দে।" বড়মনির কণ্ঠস্বরে মধু নেই। বড্ড কর্কশ।

মাথা থেকে পায়ের নখ অবধি তেল মাখালো নীলম। কি বিশ্রি গন্ধ এই তেলে! দুর্গন্ধ! আঁশটে! কোথা থেকে এই তেল আসে! একটা বৃদ্ধা এসে তেল দিয়ে যায়। বহুবছর ধরেই নাকি আসছে বৃদ্ধা। তেল দিতেই আসে। দরজা বন্ধ করে বড়মনির সঙ্গে কথা বলে! চলে যায় যখন, হাসি চুঁইয়ে পড়ে ঠোঁট বেয়ে। ধূর্ত চোখে চারপাশ দেখে দ্রুত নেমে চলে যায়। কোথায় যায়, কেউ নাকি জানে না! বাইরে বেরিয়ে তাকে আর দেখতে পায়নি শিখু দারোয়ান। এখন সিকিউরিটি গার্ড রাখা হয়েছে। পদ্ম ঝি নাকি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল বৃদ্ধা সম্পর্কে। সে অবাক প্রায় "বুড়ি? এখান থেকে বেরিয়েছে? না তো! গেটে তালা। বের হবে কেমন করে?"

অথচ, পদ্ম জানে, বুড়িটা বের হয়েই তো গেছে! সে তো বাড়ির ভেতরে থাকেনি! থাকেও না! তাহলে? কে এই বুড়ি? কেন আসে বড়মনির কাছে? কিছু কি নিয়ে আসে কাপড়ের আড়ালে? হাতটা ঢুকিয়ে রাখে কেন আঁচলের ভেতরে!

নীলম এতসব কথা শুনেছে পদ্মর থেকে। পদ্ম চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নানা কথা বলে। কিছু রেখে ঢেকে বলে। পুরনো ঝি। নীলম আগ্রহ দেখায় না। আশ্রিতকে কৌতূহল দেখাতে নেই!

বড়মনিকে তেল মাখানোর পর্ব শেষ হলে দরজা বাইরে থেকে টেনে দিয়ে বের হয়ে আসে নীলম। আজ ফুলবৌ আসেনি এখনও। বড়মনির পুজোর ফুলের কী হবে!

বড়দাবাবু সোহমের খাস চাকর যোগিন যাচ্ছে কোথায়। নীলম সিঁড়ি ভাঙে যোগিনকে ধরতে।

"যোগিন, ফুলবৌ এখনও বড়মনির ফুল দিয়ে যায়নি। একবার দেখ তো।"

(২)

ভূত দেখেছে ফুলবৌ। ভোরে উঠে বাগানে গেছিল ফুল তুলতে। খুব ভোরে উঠে ফুল তুলতে হয়। ফুল তুলেছে। সরকার বাড়িতে ফুল দেওয়া ওর নিত্যকর্ম। তো, সে কাজে আজ অব্দি ছেদ পড়েনি। তা বলে কি ফুলবৌএর অসুখ করে না? করে। তখন ভাইপো বাদলা আছে। সে ফুল পৌঁছে দিয়ে আসে সরকার বাড়িতে। বড়মনি পুজোর ফুল না পেলে যে কী করবে...! কী করবে, সেকথা কেউ জানে না। কিন্তু বড়মনি শব্দটার মধ্যে যে কী আছে, সকলেই যেন সম্মোহিত হয়ে আছে! একে অগ্রাহ্য করার কথা কেউ ভাবতেই পারে না।

কিন্তু আজ ফুলবৌ ফুল দিতে পারেনি। অসুখ না করলেও পারেনি! ভোরে ঘুম ভেঙে কৃষ্ণের শতনাম আউড়ে, ফুল তুলে, সাজি ভরে, ধোওয়া কাপড় পরে ফুলবৌ যখন রওনা দিয়েছে, বাতাসে তখন অস্পষ্ট আলো ছড়িয়েছে। আধ অন্ধকার আর আধ আলো মিলে মিশে তখন এক ঘোর লাগা সময়। রোজের অভ্যেসে অভ্যস্থ হলেও চোখদুটো যেন মাঠখানার ওপর ঢুলে পড়তে চায়। ঘুম লাগা চোখেই সে মাঠ পেরিয়ে সরকার বাড়ির গেটের সামনে পৌঁছে যায়।

আজও মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছিল। সেই ঝিমঝিমে ভোরে কোন নাম না জানা গুনিন মন্ত্রের জোরে ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। পা এলোমেলো হয়ে যায় বলে দাঁড়াল সে। চোখ টেনে খুলে দেখল, আধ আলো আধ অন্ধকারে তারাপদ দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলছে আর দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে ফুলবৌকে ডাকছে, "আয়! আয় না রে!"

তারাপদ? এখানে! এখন? সমস্ত শরীর একটা প্রকান্ড ঝাঁকি দিয়ে উঠল যেন। হিলহিল করে রক্তগুলো নেমে গেল পা বেয়ে। ফুলবৌ-এর হাত থেকে পড়ল ফুলের সাজি। মাঠময় ছড়ানো ফুলের ওপরে পড়ে রইল ফুলবৌ। জ্ঞান হারাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সে দেখেছে এগিয়ে আসছে তারাপদ। মুখটা কেটেকুটে

আসল কথা শুনল দুপুরে। চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল পদ্ম। সে ফিসফিসিয়ে গুহ্য কথাটা ফাঁস করল, "আরে, ওখানেই তো বড়বাবুর দেহটা পড়ে ছিল! কী কান্ড। অতবড় শরীরটা রক্তে ভেসে...উফ! বড়মনি একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিল! একবছরে চেহারা কত খারাপ হয়ে গেছে। আগে কি যে সুন্দর ছিল বড়মনি! বড়বাবুর অতবড় শরীরটা পড়েই শেষ হয়ে গেছে! চিৎকারটা শুনেছিলাম আমি! মরণ চিৎকার কাকে বলে, সেদিন বুঝেছিলাম।"

একাকার। রেলের চাকায় কাটা পড়ে মরেছিল তারাপদ। একবছর আগে।

কোবরেজ ডাকা হয়েছে। ফুলবৌ এখন ভুলভাল বকছে।

যোগিন খবরটুকু কেবল পৌঁছেই দিল না। আনুপুর্বিক বর্ণনাও দিল।

নীলম গালে হাত রেখে সবটাই শুনল। কোনও কমেন্ট করা ঠিক নয়। বড়মনিকে এসব বলে লাভ নেই। মাথাটা ফের গোলমাল করবে।

"আমাকে একটু ফুল এনে দে যোগিন। সোহাগির মায়ের থেকে নিয়ে আয়। বড়মনির পুজো হবে যে!" যোগিনকে পাঠিয়ে নীলম গুছিয়ে বসে চন্দন ঘষছিল। কিন্তু কেবলই তাল কেটে যাচ্ছে। তারাপদ! মাঠে দাঁড়িয়ে? তাহলে নীলম যাকে দেখেছিল, সে কে? ধবধবে কাপড় পরে...! বড়বাবুর মৃত্যুর পর বার তিনেক দেখেছে! কখনও গেটের সামনে। কখনও...!

(৩)

সাধারণত এসময় বাড়িতে থাকে না শুভব্রত। আজ ছিল। নীলম কিচেনের দিকে যাচ্ছে, শুভব্রত মায়ের সঙ্গে দেখা করতে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, মাঝপথে থমকে গেল দুজনেই।

"কেমন আছ?" তীব্র চোখে তাকাল শুভব্রত। যেন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নীলমের মন পড়ে নিচ্ছে।

"ভাল। আপনি?" নীলম ভয় পাচ্ছিল। শুভব্রতকে সকলেই ভয় পায়! ছেলেটা সুবিধের নয়। অসৎ সঙ্গে মেলামেশা ওর। কোন এক গোপন কুৎসিত আড্ডা খানায় আফিম, কোকেন কী কী সব নিতে যায়। মাদকে ভরে আছে ওর শরীর।

"ফাইন।" পাশ কাটিয়ে উঠে গেল শুভব্রত। একমুহূর্তের জড়তা কাটিয়ে নেমে পড়ল নীলম। সকাল দশটার সময়ে অন্যদিকে তাকানোর সময় কোথায়! তবু সময় হল। নানা কাজের ফাঁকে মনটা সিঁড়ির দিকে চলে যাচ্ছিল। ক'দিন ধরেই শুভব্রতর সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছে। আজ নিয়ে ক'দিন হল?

"দিদি, আজ কি ফুলকপি হবে?"

"না। আজ শুকতো হবে। কপিতে অ্যাসিড হচ্ছে বড়মনির।"

রান্নাবান্নার তদারকি সেরে বাইরে উঁকি দিল নীলম। যোগিন এল না এখনও! একটু ফুলের জন্য কত ঝামেলা! কতবার বলেছে, পেছনের অতটা জমি... কিছু ফুলের গাছ লাগিয়ে দিলে... বাড়ির দেওয়াল ঘেষে লাগালে রোদ আর ছায়া দুইই পাবে...! শুনে বড়মনি কেমন চোখে তাকিয়েছিল নীলমের দিকে! লাল কটকটে চোখ! ভয়ে নীলমের প্রাণ উড়ে গিয়েছিল। বুঝতে পারেনি কী এমন খারাপ কথা বলা হয়েছে!

আসল কথা শুনল দুপুরে। চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল পদ্ম। সে ফিসফিসিয়ে গুহ্য কথাটা ফাঁস করল, "আরে, ওখানেই তো বড়বাবুর দেহটা পড়ে ছিল! কী কান্ড। অতবড় শরীরটা রক্তে ভেসে...উফ! বড়মনি একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিল! একবছরে চেহারা কত খারাপ হয়ে গেছে। আগে কি যে সুন্দর ছিল বড়মনি! বড়বাবুর অতবড় শরীরটা পড়েই শেষ হয়ে গেছে! চিৎকারটা শুনেছিলাম আমি! মরণ চিৎকার কাকে বলে, সেদিন বুঝেছিলাম।"

নীলমের ফ্যালফেলে চোখ দেখে পন্ডিতি করার লোভ সামলাতে পারেনি পদ্ম। কম তো দেখেনি এতদিনে! বলে-কত কান্ড দেখালি মাঐ, পিঠের দেখাল ঠ্যাং! তা ঠিকই তো! বড়লোকের ঘরে কি একটা কথা? হাজার কথায় ঠাসা না হলে কি বড়বাড়ি হয়?

"কী কথা পদ্ম?" নীলম বিনুনি বাঁধে।

"এই যে দেখছ, ছোটদাবাবু, উনি হলে খারাপের রাজা। মদোমাতাল। হপ্তার পর হপ্তা বাড়িতেই এলেন না। জুয়ো ভাঙ নিয়ে মত্ত। যদি বা এলেন, আমরা সব তটস্থ। টাকা চাই। আপত্তি করলেই জিনিসপত্র ভেঙে...! বড়মনি কেন যে সহ্য করে? পুলিশে দিলেই হয়! একবার হল কি..."

"থাক পদ্ম! শুনতে নেই বড়দের কথা। আমি এদের কাছে আশ্রয় পেয়েছি। কেউ শুনে ফেললে কী ভাববে!" উঠে পড়ল নীলম।

"তা ঠিক। আচ্ছা, তুমি আগে কোথায় ছিলে দিদি?"

শেষ দুপুরের ঘোর লাগা চোখে নীলম দেখতে পায় বাবা-মাকে। কতদিন ওদের দেখেনি! তবু ভোলা যায় না! বড়মনি আশ্রয় না দিলে আজ নীলম কোথায় ভেসে যেত! কোথায় চলে গেল বাবা, মা। নীলম একা হয়ে গেল।

"কী হচ্ছে এখানে?" কর্কশ স্বর শুনে চমকে তাকিয়েছে নীলম। শুভব্রত। বড়মনির ছোট ছেলে। আজই কত ভাল ব্যবহার করেছে। এখন কেন...!

"আমি যোগিনকে... বড়মনির ফুল..."!

"বড়মনির পুষ্যির দল!" অযথাই জুতোয় শব্দ তোলে শুভব্রত। নীলম অপমানে চোখ তুলে তাকাতে

পারছিল না। বুঝল শুভব্রত চলে যাচ্ছে। আরও বুঝল, বড়মনির মুড আজ খুব খারাপ থাকবে। দুজনের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে নিশ্চয়।

"দিদি, ফুল। যোগিন এসেছে। জবা ছাড়া কিছু আনেনি।"

ফুল নিয়ে সিঁড়ি ভাঙছিল। থুম হয়ে বসে আছে বড়মনি। নীলমের দিকে লাল চোখ তুলে তাকাল, "কোথায় ছিল পর ঢলানি! রঙ্গ দেখাতে এসেছ?"

জানে নীলম। আজ কপালে দুঃখ আছে!

(৪)

দেবব্রত বাড়িতে ছিল না। পরশু এসেছে। এসে পর্যন্ত সময় পায়নি। ব্যবসার হিসেব নিকেশ তো ছিলই, অন্যান্য কাজ ছিল। হীরের শো রুমে হাজিরার ব্যাপারটাও ছিল। সুবর্না আর বাবুইকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে নিজে আর দাঁড়ায়নি। গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। একা এতসব দেখাশোনা করা যায় নাকি! শুভটা যদি কাজের হত, তাহলে কি আর...! এদিকে মায়ের শরীর ভাল নেই। মাথায় গোলমাল দেখা দিচ্ছে মাঝে মাঝে। বাবার মৃত্যুর পর থেকেই এসব উপসর্গ দেখা দিয়েছে। অথচ... বাবার মৃত্যুটা সত্যি রহস্যময়! কিছুই বোঝা গেল না। পুলিশ সুইসাইড বললেও মা মানতে চায় না। দেবব্রত নিজেও কি মানছে? বাবার মত হাসিখুশি লোক কেন আত্মহত্যা করবে! তবে মানসজ্যাঠা এর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে...! অবসাদে নাকি বাবা সুইসাইড করেছেন। দেবব্রত বুঝতে পারে না বাবার মত হাসিখুশি মানুষের মধ্যে অবসাদ এল কোন পথ দিয়ে? মানসজ্যাঠা এসেছেন। মা খাওয়াদাওয়া করছে না ঠিকঠাক। জ্যাঠা এসেছেন যদি ভুলিয়ে কিছু খাওয়ানো যায়। বাবার মৃত্যু নিয়ে একদিন জ্যাঠার সঙ্গে ভাল করে আলোচনা করতে হবে। বড় ছেলে হয়ে ওর কি উচিত না বাবার মৃত্যুর কারণটা জানা? দেবব্রত মায়ের ঘরের দিকে যাবে বলে পা বাড়াল।

"খাবারটা নিয়ে এস।" মানসরঞ্জন পর্দা সরালেন। নীলম ছুটল খাবার আনতে। বড়মনিকে নিয়ে এই এক জ্বালা হয়েছে। শুভব্রত যখন বাড়িতে থাকে না, তখন একরকম অবস্থা, বড়মনি চলতে ফিরতে পারেন তবু। অথচ সে বাড়িতে পা রাখলেই অশান্তি শুরু হয়ে যায়। সাধে কি পদ্ম পুলিশের কথা বলে? বাড়ির কাজের লোকেরাও বড়মনির ছোট ছেলেকে পছন্দ করে না। এদিকে বড়দা বাবু? উনিই সব। বাবা বেঁচে থাকতেও সব সামলেছেন। এখন কথাই নেই। বড়বাবু বড়ছেলের মতামত না নিয়ে কোন কাজ করেননি। আশ্চর্য। ছোটছেলের স্বভাব নাকি বাবার মত! বড়বাবু কি অমন ছিলেন? তাহলে কি আর এত সম্পত্তি করতে পারতেন? এই যে মানসজ্যাঠা, উনি নাকি বড়বাবুর আপন ভাই নন। একসময়ে শরিকি গোলমাল ছিল। কিন্তু এখন কত ভাব!

ঠুং ঠুং করে কমলালেবুর রসে চামচ নাড়ে নীলম। এই যে বাড়িখানা, লোকে বলে বড়বাড়ি। সত্যি কত যে ঘর, কত যে বারান্দা, প্যাসেজ... দিশেহারা হয়ে যায় নীলম। শরিকি গন্ডগোল থাকে বড়লোকদের মধ্যে। তবে, বড়বাবুর পৈতৃকসূত্রে পাওয়া সম্পত্তির পরিমাণ প্রচুর ছিল। উনি সেটা ভাগ হতে দেবেন কেন? নিজের দুটো ছেলে, বউ আছে। সে না থাকলেও নিজের সম্পত্তি উনি কেন অন্যের হাতে দেবেন?

দুটো সন্দেশ, ফলের রস নিয়ে বড়মনির ঘরের দিকে যাচ্ছিল নীলম। পর্দা সরাতে গিয়ে থমকে গেল। ভেতরে মানসজ্যাঠার গলা পাওয়া যাচ্ছে। নীলম একটু ইতস্তত করে পর্দা সরাল। বড়মনি বিছানার ওপরে একটু এলোমেলো...! জ্যাঠাবাবু বড়মনির ঘাড়ের কাছে মুখ নিয়ে অত্যন্ত নীচু স্বরে কিছু বলছেন। গভীর গাঢ় মুহূর্ত!

নীলমের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওকে সজাগ করে দিল! চলে যাওয়া দরকার। এখানে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই। একটা অদ্ভুত কিছু অনুভূত হচ্ছে! এসব দেখতে নেই। বুঝতে নেই! আশ্রিতকে অন্ধ সেজে থাকতে হয়। সেটাই নিয়ম।

(৫)

প্লেটের ওপর দুটো সন্দেশ, আর ফলের রস নিয়ে ঠায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল নীলম। একরাশ জামাকাপড় নিয়ে ছাদের দিকে যাচ্ছে পদ্ম। নীলমকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রায় অবাক, "মরণ। করছো কী?"

ডাকতে গিয়ে থেমে গেল নীলম। ভেতরে কথা শোনা যাচ্ছে। চারপাশে সতর্ক চোখ বুলিয়ে নিল নীলম। ভেতরে কী হচ্ছে? ভারি পর্দার ওপর কান পেতে দাঁড়াল। অস্পষ্ট কথা শোনা যাচ্ছে। এই রে! কেউ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে! নীলমকে ওভাবে কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে কী ভাববে! চট করে নিজেকে সামলে নিল নীলম। পর্দা সরাতে গিয়ে শুনতে পেল মানসজ্যাঠা বলছেন-জবালা! খাবে না? আমার কথা রাখবে না? তুমি বুঝতে পারছ না, তুমি না খেলে...।

"না, বড়মনির খাবার... যাচ্ছি।" দ্রুত চলে যায় নীলম। পদ্ম মুখ বেঁকাল। এ বাড়ির সবাইকে ভূতে পেয়েছে!

হাত কেঁপে যাচ্ছিল। নিজেকে ধমক দিল নীলম। অবাক বা নার্ভাস হওয়ার কিছু নেই। এটাই কি স্বাভাবিক নয়? ভাইয়ের বৌএর সঙ্গে বন্ধুর মত সম্পর্কই তো ভাল। এ কি সাধারণ ঘরের মত? একটু সাবধানে এগিয়ে গেল নীলম। পায়ের শব্দ তুলেছে ইচ্ছে করেই। মানস জ্যাঠাকে ও ভয় করে। কেন করে নিজেই জানে না। আসলে জ্যাঠার মধ্যে সাঙ্ঘাতিক পারসোনালিটি রয়েছে। বড়মনি পর্যন্ত জ্যাঠার কথা মেনে চলে।

"জ্যাঠাবাবু!" ডাকতে গিয়ে থেমে গেল নীলম। ভেতরে কথা শোনা যাচ্ছে। চারপাশে সতর্ক চোখ বুলিয়ে নিল নীলম। ভেতরে কী হচ্ছে? ভারি পর্দার ওপর কান পেতে দাঁড়াল। অস্পষ্ট কথা শোনা যাচ্ছে।

এই রে! কেউ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে! নীলমকে ওভাবে কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে কী ভাববে! চট করে নিজেকে সামলে নিল নীলম। পর্দা সরাতে গিয়ে শুনতে পেল মানসজ্যাঠা বলছেন-জবালা! খাবে না? আমার কথা রাখবে না? তুমি বুঝতে পারছ না, তুমি না খেলে...। কোমল, পুরুষালি ব্যাক্তিত্ব নিয়ে কথা বলছেন জ্যাঠাবাবু। কন্ঠস্বরে কী ছিল, বুক ধুকপুক করছিল নীলমের। অপূর্ব মাদকতাময় কন্ঠ। আর দেরি করা সম্ভব নয়। পর্দার এ পাশ থেকে ডাকল নীলম, "জ্যাঠাবাবু!"

"কে? ওহ! এস। তোমাদের বড়মনি রাগ করেছেন। তোমরা ভাল হয়ে থাক না কেন? তাহলে তো আর অসুবিধে হওয়ার কথা না।" কথা বলতে বলতে জ্যাঠাবাবু বারবার বড়মনির মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। আর বড়মনি বিশাল চোখ তুলে জ্যাঠাবাবুর দিকে তাকিয়ে আছে। নীলম অস্বস্তি বোধ করছিল। বড়মনির দৃষ্টিতে অদ্ভুত কিছু আছে! অদ্ভুত কিছু!

"বড়মনি, খাবেন না?" নীলম চোখ মেঝের দিকে রেখেছে। স্বর নীচু। বড়মনি জোরে কথা বলা পছন্দ করে না।

(৬)

"তোমার শাশুড়ি কেমন আছেন?"

"আসুন জ্যাঠাবাবু। মা ভাল আছেন।"

"নীলমের খবর কী? ওকে বল, এক গ্লাস জল পাঠিয়ে দিতে।"

"মায়ের সঙ্গে কথা বলবেন?"

"নাহ। ভাল আছে শুনলাম। ব্যাস। ...তোমার শ্বশুর যে কি বিরাট দায়িত্ব দিয়ে গেলেন! সারাজীবন সংসার করলামও না। অথচ শেষ বয়সে এসে এই ভার কতটা বয়ে নিতে পারব জানি না! ব্যাটাচ্ছেলে, মরে গিয়েও শান্তি দিলি না। জীবিত দশা কাটালি আমারই সঙ্গে বিবাদ করে!" মানসরঞ্জনের চোখ জলে ভরে গেল।

"আপনি বসুন।" সুবর্ণা দ্রুত চেয়ার এগিয়ে দিল, "কী আর করবেন বলুন। বাবা যে এভাবে ফাঁকি দেবেন, সে কি আমরা বুঝতে পেরেছিলাম? কত হাসি গল্প করলেন আমাদের সঙ্গে আগের দিনও। আমায় বললেন, "তোমার শাশুড়ির প্রচুর গয়না আছে, ও বেঁচে থাকতে থাকতে নিয়ে নাও। নয়তো কাকে না কাকে দান করে যাবে, তার ঠিক কী!" সেদিন লুচি খাচ্ছিলেন। ফুলকো লুচি ভালবাসতেন। সঙ্গে আলুর দম। ইদানিং তো মাংস খেতেন না। মার সঙ্গে খুব ঠাট্টা করে কথা বলতেন, "অত রেগে রেগে কথা বল কেন? এত বছর পরেও কি আমাকে পছন্দ হল না?" ...সত্যি, কল্পনা করা যায় না। আচ্ছা, বাবা যে সুইসাইড করতে পারেন, তা কি কখনই মনে হয়েছে আপনার?"

"মানুষের মনস্তত্ব বড় আজব জিনিস, বুঝলে। একটা গল্প শুনেছিলাম। এক ভদ্রমহিলা ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। বড় শখ ছিল, নিজের বাড়ি হবে। ধীরে ধীরে একটা জমি কেনা হল। বাড়ি উঠল। মনের মত করে বাড়ি সাজালেন। ছেলে স্বামী নিয়ে নতুন বাড়িতে উঠলেন। সাজালেন, গুছোলেন। রিলেটিভ, বন্ধুবান্ধবে ভরে গেল গৃহপ্রবেশের দিন।

সেদিন আনন্দে ছলছল জীবনে তার মনে হল, এই তো, সব পাওয়া হয়ে গেল। এই সুখ কি সারাজীবনে আর পাবেন? তার চেয়ে এই আকণ্ঠ পরিতৃপ্তি নিয়ে চলে যাওয়াই তো ভাল! ভোররাতে গলায় দড়ি দিয়ে...! সুতরাং...! এই যে তোমাকে দেখছি, তোমার অন্তঃস্থল কি দেখতে পাচ্ছি! কী আছে তোমার মনের গভীরে আমি কি জানি? সেখানে কী চলছে, কেউ কি জানে?"

সুবর্ণা কেঁপে উঠল কেন কে জানে। মানসরঞ্জনের স্থির চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে ওর অস্বস্তি হচ্ছিল।

"আপনি বসুন, ওর খাবারটা..." দ্রুত সিঁড়ি ভাঙে সুবর্ণা। জ্যাঠাবাবুর চোখ দেখে ভয় হয়। যেন সব দেখতে পাচ্ছেন!

(ক্রমশ)

ডুয়ার্সের সাতকাহন

অমিত কুমার দে

কবির কলমে

নতুন সংযোজন— কবি লিখবেন গদ্য ! এবং আমাকেই প্রথম লেখাটি দিতে হবে। সম্পাদক জানালেন বিষয় যা খুশি হতে পারে— পাখি, রাস্তা, বিড়ি, অন্তর্বাস, মানুষ, অমানুষ... যা খুশি ! এই বিরাট মানচিত্র খুলে দেওয়ায় কবিমশাই আরো বিপদে পড়ে গেলেন। তিনি স্বচ্ছন্দে ঘুরতে পারেন কবিতার ক্যানভাসে। গদ্য মানে বুকটা ধক্‌ধক্‌ করে বটে ! তাই গদ্য লিখতে বসে ঠিকই করে নিলাম বাঁধাধরা কিছু নয়, যেদিকে লেখা এগোয় এগোক্‌ ! আর যতই যেদিকে টানাটানি হোক্‌, এমনকি সম্পাদকের গোপন কাটমানির প্রলোভন থাক্‌— আমি কিন্তু ডুয়ার্স থেকে বের হব না। আমার সঞ্চয়ের কিছু নিসর্গ আর মানুষের কথা লিখি, কিছু কিছু ছবি জোড়া দিই !

১

তখন ক্লাস ইলেভেন ! দিনহাটা সোনীদেবী জৈন হাই স্কুলের ক্লাসে গুরুদাস-স্যার পড়ালেন উইলিয়াম ওয়ার্ডওয়ার্থের 'দ্য সলিটরি রিপার'। বুঁদ হয়ে শোনা। পাহাড়ি ঢালে এক পাহাড়কন্যা ফসল কাটতে কাটতে দুর্বোধ্য ভাষায় এক দুঃখ-দুঃখ গান গেয়ে চলেছে, আর সারা উপত্যকা নিঃস্তব্ধ হয়ে শুনছে সেই গানের ম্যাজিক। তার কাস্তে চুঁয়ে চুঁয়ে মেলোডি নীচে নেমে আসছে আর খাদ ভরিয়ে দিচ্ছে। কবিতাটি পড়তে পড়তে এক ঘোর পেয়ে বসল। এক রোববার বন্ধু প্রদীপ সাহার সঙ্গে ভুটানের সামচিতে পাড়ি দিলাম। সেই পাহাড়কন্যার খোঁজে। বাসে জিপে কোনওমতে অচেনা জায়গায় পৌঁছে পায়দল। ভিড় জনবসতি এড়িয়ে পাহাড়ি গ্রামে দুই বন্ধু পোঁছেও গেলাম। ঢাল বেয়ে উঠছি নামছি। হঠাৎ প্রদীপ ফিসফিস করে উঠল— 'অমিত, দ্যাখো !' তাকিয়ে দেখি হুবহু সে-ই ! ভুট্টা কাটছে আর গুনগুন করে গাইছে। ভুটানি কথা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। দু'জন নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আর কোথাও কেউ নেই। অনেকক্ষণ পর সম্বিৎ ফিরল পাহাড়ি কুকুরের চিৎকারে। সেই রোমান্টিক জার্নির শেষটা মোটেও সুখকর নয়। তাগড়াই দুটো কুকুরের তাড়া খেয়ে ছুটতে ছুটতে পাহাড় থেকে নেমে আসা। পাহাড়কন্যাকে 'বিদায়' বলার সুযোগটুকুও হয়নি সে যাত্রায়। বহু বছর বয়ে গেছে। এখনও কিন্তু পাহাড়ে গেলেই সেই সলিটরি রিপারকে খুঁজে বেড়াই।

২

দিনহাটা কলেজে 'ম্যাকবেথ'-এর একটা সলিলকি পড়াতে পড়াতে অনিলবন্ধু দত্ত আচমকা থেমে বলেছিলেন, 'জানিস্‌, রোজ দিনহাটা থেকে কোচবিহারে ফিরতে ফিরতে জানালা দিয়ে সূর্যাস্ত দেখি। কিন্তু বছরের কোনও গোধুলির সূর্য ডুবে যাওয়ার রঙ অন্য কোনও দিনের মত হয় না। প্রতিদিনের রঙের খেলা আলাদা আলাদা। এটাই আমাদের উত্তরের শেষ বেলার আকাশ। প্রকৃতি যে কত বড় পেন্টার এখানে !' তখন থেকেই

আমার শেষ বেলার আকাশ খোঁজা শুরু। সূর্যাস্তের আকাশ দেখার সবচেয়ে ভাল জায়গাটি আবিষ্কার করেছি ডুয়ার্সে। গয়েরকাটা চা-বাগানের প্রান্তে গিয়ে এই আকাশ দেখা যেন নেশায় পরিণত হল। বাগান শেষ, তারপর একফালি নদী, উপত্যকার মত অনেকটা সবুজ জমি, তার ওপারে মোরাঘাট বন। বনের মাথার আকাশ অন্যরকম হয়ে যায় তখন, ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলায়। এবং একদিনের সঙ্গে অন্য দিনের মিল থাকে না। উজ্জ্বল থেকে শান্ত, তারপর ক্রমে ম্লান আরও ম্লান। ডুয়ার্সের আকাশ একসময় বিষণ্ণতা আঁকতে আঁকতে চলে যায় রাত্রির দিকে। রঙের সঙ্গে সঙ্গে ডেকে ওঠে রঙের পাখিরাও। ময়ূরের টানা টানা ডাকে দিনের ইতি।

৩

খুনিয়া মোড়ে এলে বারবার মনে মনে খুন হয়ে যাই ! চারদিকের বন-বন রাস্তা একসঙ্গে আমার জামা ধরে টানতে থাকে ! ত্রিপল টাঙানো একখানাই চায়ের দোকান। কাঠ দিয়ে বসার জায়গা। পাত্রে ঢাকা মোমো, ঘুগনি। আমি এখানে দিওয়ানা হয়ে কত দিন যে বসে থেকেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, নিজেই জানি না। তারপর কখনও মূর্তি, কখনও সিপচু, কখনও বিন্দু ঝালং, কখনও চালসা। এটা বাকি জীবনও চলতেই থাকবে জানি। একদিন বসে আছি একা একাই। একলা দুপুর গড়াচ্ছে বিকেলের দিকে। বনবস্তিতে মাছ বিক্রি শেষ করে এক মাছুয়া এসে পাশে বসলেন। তার কাছ থেকে আবার শুনলাম বনের গল্প, বনবস্তির কথা, হাতি আর বাইসনের আখ্যান। বারবার শুনলেও যা পুরনো হয় না। চায়ে চুমুক শেষ হলে তিনি বললেন— 'যাই, সন্ধে হলে হাতির মুখোমুখি হতে হবে ! আপনি বসুন !' আমি বসে বসে চাপড়ামারির রাস্তায় কিছু বাঁদরের খেলা দেখছিলাম। এক ধোপদুরস্ত

ভদ্রলোক এসে বসলেন। সিগারেট ধরিয়ে দার্শনিকের মত আকাশ দেখতে থাকলেন। তাঁর দিকে কিছুটা এগিয়ে বললাম— 'আপনি কি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন?' আমার দিকে না তাকিয়ে গম্ভীরভাবে সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন— 'না'। আরেকটু এগিয়ে বললাম— 'তবে কি ট্যুরিস্ট?' এবারো ক্ষুদ্রতর জবাব— 'না'। এবার প্রায় গায়ের কাছে গা নিয়ে বললাম— 'তাহলে কোথাও গিয়েছিলেন? বাড়ি ফিরছেন বুঝি? কাজে?' বিরক্তি নয়, উপেক্ষা নয়, নিরাসক্তির রেশ রেখে উত্তর দিলেন— 'না'। মরিয়া হয়ে জানতে চাইলাম— 'তবে?' তিনি বললেন— 'হাতি তাড়াই।' প্রায় হাত ধরে ফেলছিলাম আর কি! অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে বললাম— 'বললেন যে বনদপ্তরে কাজ করেন না, তাহলে হাতি তাড়ান কীভাবে?' তিনি এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দয়ালু চোখে বললেন— 'বনদপ্তরের প্রয়োজন হলে আমায় ডেকে নেন। কাল রাতেও বিশাল এক পাল হাতিকে তাড়িয়েছি। আর বনবস্তিতে একটা হোম-স্টে আছে আমার, স্থানীয় একজনের সঙ্গে। ওখানে থেকে শুদ্ধ বাতাস নিই মাঝে মাঝে।' আমি বললাম— 'এখন ওখানে যাবেন বুঝি? আপনার সঙ্গে যেতে পারি?' তিনি আচমকা দাঁড়িয়ে বললেন— 'ফলো মি!' তাঁর চার চাকার পেছনে পিছনে আমিও গাড়ি চালালাম। হোম-স্টে-তে পৌঁছে লোকটির মুখের আদল বদলে গেল। সব গাম্ভীর্য ঝেড়ে কী আন্তরিকভাবে আমায় বললেন— 'আসুন।' এক নেপালি সুন্দরীকে ডেকে বললেন— 'চা করো, আমার বন্ধু এসেছে।' মুগ্ধ সন্ধে ঘন হয়ে আসতে লাগল, আর আমি তাঁর কাছ থেকে ডুয়ার্সের হাতির গল্প শুনছি। তখন বুঝিনি, এখন বুঝি ওই সন্ধেটা কীভাবে যেন মহার্ঘ্য হয়ে গেল।

৪

আর দেখলাম কোদালবস্তির বাঁয়া গণেশ-কে। ব্লু হোম স্টে-র বারান্দায় সারা রাত বসে বসে দেখছিলাম একটা হাতি কীভাবে মানুষদের রীতিমতো ঘোল খাওয়াচ্ছে! তাকে যেন-তেন প্রকারেন ভুট্টা খেতেই হবে। রাতের অন্ধকার নামলেই জঙ্গল থেকে পা টিপে টিপে ঢুকে পড়ছে গ্রামে। অতিকায় চেহারা মাটি কাদা মাখা। সার্চলাইট পড়তেই মুখ তুলে স্থানু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন স্ট্যাচু! বাঁ-দিকের বিশাল দাঁতটা তলোয়ারের মত ঝকঝক করছে। এক ঝাঁক কুকুর তাকে তাড়া করতেই শুঁড়ে পাথর তুলে মানুষের মত ঢিল মারতে লাগল। প্রতিটি রাভা বাড়ি থেকে সার্চ লাইট ঝলসে উঠল। বেগতিক দেখে সে ছুট্ লাগাল জঙ্গলের দিকে। হোম স্টে-র তরুণ মালিক বলল— 'আবার আসবে দেখবেন!' রাত জেগে বসে থাকলাম কাঠের দোতলার বারান্দায়। রাত দেড়টায় আবার সে পা টিপে টিপে ভুট্টাক্ষেতে হাজির। মাঝরাতে কুকুরের চিৎকারে আবার জেগে উঠল রাভাবস্তি। হাতি-মানুষের এমন লুকোচুরি খেলায় বনবস্তির ঘুম উধাও। বাঁয়া গণেশ বীরদর্পে ক্ষেত সাবাড় করে, মানুষ মারে। রেগে পর্যটকের গাড়ি দাঁতে ফুটো করে উল্টে রাখে। রাত পেরোলে রাভা কিশোর দেখায় কীভাবে সুপুরি বাগান ভেঙেচুরে শেষ করেছে সে। কিন্তু বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ নেই গলায়— 'কী আর করবে, অত বড় পেট, খাবারের জন্যই তো আসে।'

৫

চাপড়ামারি রেলগেটে এখন প্রায়ই ভিড় জমে। সে সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে। হাতি এসে কীভাবে রেলগেট ভেঙে কত কারসাজি করছে, বাইসন রেললাইনের পাশে ঘাস খেতে খেতে চলন্ত ট্রেন দেখছে, রেললাইনের ওপর খুঁটে খাচ্ছে ময়ূরের দল— এসব ভিডিও সারা বিশ্ব দেখেছে। তাই শখের ভ্রমণকারীরা এখানে জটলা করেন। কিন্তু এমনটা আগে ছিল না। এক অদ্ভুত নৈঃশব্দ আর অরণ্যের ধূপ নিয়ে চুপচাপ থাকত এই রেলওয়ে ক্রশিং। আগে গেছি বহুবার, এখনও যাই। ব্যান্ডেলের দিকে বাসা শেখর সেনগুপ্ত-র, তরতাজা তরুণ, এখানে রেলদপ্তরের গার্ড, অরণ্য চিরে ছুটে যাওয়া রেলগাড়িদের সে ফ্ল্যাগ দেখায়। প্রায়ই তাঁর সঙ্গে গিয়ে ওখানে দাঁড়াই ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সে আঙুল তুলে দেখায়— 'ওই দেখুন, কতগুলো ধনেশ পাখি, ওই যে একটা বুনো শূয়োর রেললাইন ক্রশ করছে, ওই দেখুন— দেখুন্ না...'। গাছের গা থেকে জমাট আঠা তুলে বলে - 'এই ধুনো ব্যান্ডেলের ঘরে আমার বউ যখন জ্বালায় আমি ঘরে গিয়েও বনের গন্ধ পাই!' বনে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া মদের বোতল কুড়িয়ে সে বন পরিষ্কার করে, বিড়বিড় করে বলে— 'কী আক্কেল দেখুন, হাতিগুলো এদিক দিয়ে যায়, কাচ পায়ে ফুটে কত কষ্ট পাবে বেচারারা!'

৬

শুধু কি হাতি গন্ডার হরিণ বাইসন? মানুষগুলো? সম্প্রতি ধুঁকে ধুঁকে খুলেছে, কিন্তু দুঃসময়ের ভয় তাড়া করে বেড়াচ্ছে গ্রাসমোড় বাগানকে। কখন কীভাবে যেন বাগানটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। মাসের পর মাস বন্ধ বাগানের ইলেকট্রিক লাইন কেটে দেওয়া হল। স্টাফ আর সাব-স্টাফদের কী দুর্দশা, তারা তো আর শ্রমিকের কাজ করতে অভ্যস্ত নয়। তাদের ঘরের ছেলেমেয়েগুলো পড়াশুনা করছে। অন্ধকার কত ভয়ানক ওদের কাছে গিয়ে বুঝলাম। চারদিকে সাপের আতঙ্ক। টর্চলাইট জ্বালিয়ে যেতে যেতে বিষাক্ত সরীসৃপের মুখোমুখি। প্রশাসনও মুখ ফিরিয়ে থাকল মাসের পর মাস। বাগানের বাচ্চাগুলো গিয়ে সন্ধের পর নাগরাকাটা বিডিও অফিস প্রাঙ্গণে সোলার বাতির নীচে পড়তে বসত। দিনের পর দিন। ঘরে আলো জ্বাললে আমার মনে ওদের মুখ ভেসে উঠত। ছুটে গেছি একাধিকবার। কিছু করতে পারব না জেনেও এক অক্ষম যন্ত্রণায়। নাগরাকাটা বিডিও অফিসের কালভার্টে বসে বন্ধ বাগানের এক সাবস্টাফ বলছিলেন— 'বাগানের বাইরের জগৎ খুব একটা জানি না। অন্য কোনও কাজ এ বয়সে করতেও পারব না। লেবাররা অন্য কোথাও লেবারি জুটিয়ে নেয়। বাবা চা-বাগানের কাজ করতেন, তার অবসরের পর আমি। সকালে ফ্যাক্টরিতে যাই, সন্ধে গড়িয়ে ফিরি। ছুটির দিন হাটবাজার। এতেই খুব সুখী ছিলাম জানেন। বাগান বন্ধ হল হুট করে। সব অন্ধকার হয়ে এল। যা টাকা জমিয়েছিলাম সব একে একে তুলে ফেললাম। শখের বাইকটা বেচে দিলাম। একটা সেকেন্ড হ্যান্ড চার চাকা কিনেছিলাম, বিক্রি করতে গিয়ে দেখি চোদ্দ হাজার টাকার বেশি দাম উঠছে না। ছেলেমেয়েগুলোকে ভাল স্কুলে ভর্তি করিয়েছি। যত্নে বড় করছিলাম। কী যে হয়ে গেল। রাস্তায় বসিয়ে স্ট্রিটলাইটে ওদের পড়াতে হচ্ছে। এরপর কী হবে জানি না। বন্ধু বা পরিচিতদের কাছ থেকে পাঁচ দশ হাজার টাকা ধার পেতে পারি। কিন্তু কতবার?' অন্ধকার আকাশের দিকে তিনি তাকিয়ে একটা ভয়ঙ্কর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আর নিজেকেই কী ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছিল। কেন চা-বাগান বন্ধ হয়?

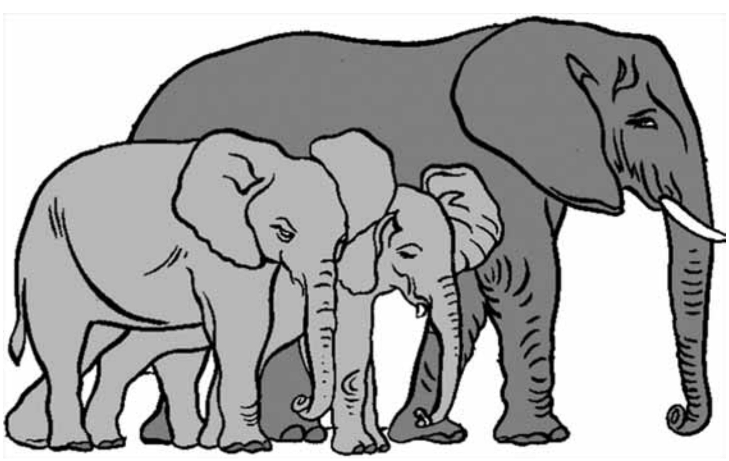

৭

মিরিক পেরিয়ে কয়েক কিলোমিটার যেতেই হাতের নাগালে স্বর্গ চলে এল। গোলপাহাড়। গোল-গোল পাহাড় ঘিরে চায়ের গাছ। গাড়ি থেকে নেমেই ছুট্। পাহাড়ের শরীরী ভাঁজে পৌঁছতেই আমার মুক্তি আলোয় আলোয়...! বিকেল সন্ধের দিকে ধীরে ধীরে হাঁটছে। পায়ের নূপুরের মত অদ্ভুত ঝিঁঝির আওয়াজ সম্মোহিত করে তুলেছে। মোহাবিষ্টের মত হাঁটছি। পাইনের গাছগুলো আবছায়ায় কত ধরনের আকৃতি তৈরি করে যে দাঁড়িয়ে আছে! বাগানের নাম গোপালধারা। একজন বলেছিলেন— এখানের চা পৃথিবীবিখ্যাত। বাগান থেকে ফিরে এসে রাস্তার ওপরেই চায়ের দোকানে ঢুকলাম। কী যত্নে, কত শৈল্পিকভাবে গোপালধারা বাগানের চা বিক্রি হচ্ছে। চায়ে চুমুক দিতেই চমক। এ তো অমৃত! ট্যুরিস্টরা প্রায় লাইন দিয়ে চা-পাতা কিনছেন। দোকানমালিক ওয়াংচেন তামাং জানালেন— হোয়াটস অ্যাপে জানালে ক্যুরিয়রে চা-পাতা পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত রয়েছে। প্রচুর চা প্রতিদিন এভাবে পাঠানো হয়। আমার ডুয়ার্সের দুঃখী বাগানগুলোর কথা মনে পড়ছিল। কত কিছু করা যায়। চা-বাগানগুলোয় সেখানকার পরিকাঠামো কাজে লাগিয়ে হোমস্টে রিসর্ট তৈরি করে গাঢ় সবুজে পর্যটকদের থাকবার ব্যবস্থা করা যায়, আর পর্যটকের ঢলকে সামনে রেখে উৎপন্ন চায়ের বিপণন করা যায়। কিন্তু ডুয়ার্সে যেটা এখন সহজে করা যায়— তা হল বাগানে তালা ঝোলানো আর নোংরা রাজনীতি করা। মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের ডুয়ার্স আদৌ এমন নির্মল সবুজ থাকবে তো? যেমন রেড ব্যাঙ্কের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কান্না পায়। হয়ত একদিন চা-বাগান শেকড় সমেত উপড়ে এখানে শিল্প হবে! ধোঁয়া আর বিষে বদ-নগর হয়ে উঠবে রূপসী ডুয়ার্স। জেন্ডার পাল্টে যাবে!

তবু এই ডুয়ার্সেই নিজের মুখ নিজে দেখি। কাঙালের মত প্রার্থনা আঁকি চরাচরে।

কেমন আছ লাটাগুড়ি ?

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

ভ্রমণের ভূত আজও দিব্যি কাঁধে চেপে বসে আছে। আসলে সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। ভূতের কিল খাওয়ার মধ্যে জব্বর আনন্দ। পায়ের তলায় সর্ষে অবিরাম যেন সুড়সুড়ি দিয়ে চলেছে। ঘরের বাঁধন এক নাগাড়ে অসহ্য, বন্দীদশার মতন। তাইতো বেরিয়ে পড়ার তাগিদ প্রতিনিয়ত অনুভব করি। জানি না কেন এই ভরপুর জীবনের প্রতি এত টান। আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ। আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হতে ভাইরে, বায়ুর কাছে কর্মী হবার মন্ত্র আমি পাইরে। আসলে চরৈবেতি একপ্রকার নেশা। যাঁরা রাহুল সাংস্কৃত্যায়নের ‘ভবঘুরে শাস্ত্র’ কিংবা প্রবোধ সান্যালের মহাপ্রস্থানের পথে পড়েছেন তাঁরা আমার উপলব্ধিকে অনুভব করবেন। তবে আমার কাছে গুরুরূপে যাকে মনে হয়েছে বা বরণ করেছি তিনি হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায় অচেনার আনন্দকে পাইতে হলে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে তাহার কোনও মানে নাই। একশো ভাগ সত্যি। কবির ভাষায় দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া। একদা ঝোলা কাঁধে, ক্যাম্বিসের ব্যাগ সম্বল করে ভ্রমণং যত্র তত্র শয়নং হট্ট মন্দিরে জপ করতে করতে বেরিয়ে পড়তাম।

মনে পড়ে এভাবেই একবার মেটেলি হাট, চা-বাগান ঘুরে বেড়িয়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে মেটেলি কালীবাড়িতে কাঠের বেঞ্চে ঝোলা মাথায় দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। গভীর নিদ্রাভঙ্গ হল দুলু দে-র ডাকে। পরে জেনেছি তিনি কালীবাড়ির একজন বিশিষ্ট কর্তা ব্যক্তি। তাঁর প্রশ্ন— মশাই আপনি কে? কোথায় থাকি, কী করি এখানে কেন শুয়ে আছি। সত্যি কথাই তাকে নিবেদন করাতে তিনি তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং অনুরোধ করলেন রাতে থাকতে। তাঁর বাড়ির বাইরের ঘরে ছোট একটি তক্তাপোষে আমার থাকার ব্যবস্থা করলেন। বললাম ভাই আমি মুশাফির। জানি না আমার সম্পর্কে আপনি কী ভাবছেন? দুলুবাবু বললেন আমি লোক চিনি। আপনি মেটেলি কালীবাড়ির ইতিবৃত্ত লিখুন। আপনাকে আমি তথ্যাদি দেব বলে বিস্তর কাগজপত্র এনে হাজির করলেন।

পরবর্তীকালে নাগেশ্বরী চা-বাগানের এক শ্রমিক পরিবারে রাত্রিযাপন করেছিলাম। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। তারও অনেক আগে চালসার গোপালদার ছোট্ট কাঠের ঘরে থাকা ভুলিনি। উনি তখন চালসার ডুয়ার্স ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় চাকরি করতেন। তবে সবথেকে স্মরণীয় স্মৃতি সামসিঙের কাঠের বাংলোতে থাকা। সে এক বাউন্ডুলে জীবন কিন্তু গিন্নিকে সাথে করে বেড়ানো আরেক অভিজ্ঞতা। দুজনের ইচ্ছা, রুচি, ভাললাগা কিছুই মেলে না। তবে হ্যাঁ ভ্রমণের বিষয়ে তার কোনও না নেই। ভেটো বা আপত্তি নেই। অনেকের প্রশ্ন যদি না ঘুরে বেড়াতেন তাহলে ডাকঘরে, ব্যাঙ্কে লক্ষ-কোটি টাকা জমাতে পারতেন। কী হবে তাতে? অস্থায়ী জীবনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতি আমার

ঘুমিয়ে পড়া শান্ত নির্জন নীরব জনপদ লাটাগুড়ি। গুটিকয়েক কাঠের স'মিল আর পথের দু'ধারে কাঠের একতলা-দোতলা ঘরবাড়ি। রিসর্টের কোনও বালাই ছিল না। ইকোটুরিজম নামক হলুদের গুড়ো তখন আবিষ্কার হয়নি। অনেকে ভাবত ইহা খায় না মাথায় দেয়? সন্ধেবেলায় লাটাগুড়ির পথে টিমটিম করে আলো জ্বলত। নিঝুম পরিবেশ।

কোনও মোহ নেই। যখন ইচ্ছা পরিযায়ী পাখির মত ডানা মেলে উড়ে যাই, যা টাকা পয়সার আনন্দের চেয়ে ঢের বেশি। বাইরের ডাক শুনে শুনে অস্থির। এখন দুজনেই মিলে মিশে ঝগড়াঝাটি করে রাগ অভিমানের মধ্যে দিয়ে যখন যেখানে ইচ্ছে দূরে অদূরে বেরিয়ে পড়ি। পথে চলার আনন্দ যে কী সে পথিক অন্তর দিয়ে অনুভব করে। আমি নিত্য চলার পথিক। পথিকজনের লহ নমস্কার।

ভদ্রেশ্বরের ভ্রমণ আড্ডার মধ্যমণি স্নেহভাজন শক্তি-র উক্তি আমি নাকি ডুয়ার্সের লাইটহাউস সবজান্তা। সেটি বলতে পারব না তবে ডুয়ার্স আমার কাছে তরাই সুন্দরীর চেয়েও অনেক বেশি আকর্ষণীয়। পছন্দের সৌন্দর্যখনি। হাতেখড়ি শুরু হয়েছিল ডুয়ার্সের নাগরাকাটাতে। তারপর থেকে অন্তহীন পরিক্রমা, সফর, বেড়ানো— আজও ছেদ পড়েনি। কম আর বেশি তার হিসাব মেলাতে ‘মন মোর নাহি আজ রাজি’। লাটাগুড়ি দিয়েই শুরু করা যাক। দেখতে দেখতে পঞ্চাশটা বছর কেমন করে যেন ফুড়ুৎ করে পেরিয়ে গেল। পরিচয়ের প্রথম সূত্র বা মাধ্যম যাই বলুন লাটাগুড়ির জমিদারবাড়ির পরাণ গোপ যাকে আমি বলি লাটাগুড়ির লাঠি। ওকে সঙ্গে নিয়ে লাটাগুড়ি সন্নিহিত বনে-বাদাড়ে অজস্রবার ঘুরে বেড়িয়েছি। মাঝেমধ্যে দুই সাকরেদ রতন ও চঞ্চল সঙ্গে থাকত। অচেনা লাটাগুড়িকে যদি আবিষ্কার করে থাকি তবে ওদের সাহচর্য-ভালবাসা উপেক্ষণীয় নয়। ঘুমিয়ে পড়া শান্ত নির্জন নীরব জনপদ লাটাগুড়ি। গুটিকয়েক কাঠের স'মিল আর পথের দু'ধারে কাঠের একতলা-দোতলা ঘরবাড়ি। রিসর্টের কোনও বালাই ছিল না। ইকোটুরিজম নামক হলুদের গুড়ো তখন আবিষ্কার হয়নি। অনেকে ভাবত ইহা খায় না মাথায় দেয়? সন্ধেবেলায় লাটাগুড়ির পথে টিমটিম করে আলো জ্বলত। নিঝুম পরিবেশ। সেই সময়ের থাকা খাওয়ার ঠেক বলতে পরাণের হাটতলায় লজঝর কাঠের দোতলা। ডান দিকে সুধীরদার ছোট্ট মিষ্টির দোকান। সেখানে গেঁজুপার্টি আর কিছু খদ্দের। হাটের দিন মাছির মত ভনভন করত। বিকেলে কী সকালে বিচাভাঙা যেতে বক্ষ দুরুদুরু। প্রবীণদের কাছে শুনেছিলাম তিরিশের দশকে লাটাগুড়িতে দিনের বেলাতেই বাঘের ডাক শোনা যেত। লাটাগুড়ি স্টেশন থেকে রামশাই স্টেশন ছিল দারুণ থ্রিলিং অ্যাডভেঞ্চারাস রেল সফর।

বিয়ের পর পরাণের অনুরোধ, দাদা একবার বৌদিকে সঙ্গে করে চলে আসুন। এখানে একটু উল্লেখ না করে পারছি না লাটাগুড়ির প্রথম যাঁরা পর্যটক তাঁরা

লাটাগুড়িতে জঙ্গল সাফারি

হলেন ধানবাদের মৈত্রেয়ী দিদিমণিরা, সেসব নিয়ে ‘বনপথের পাঁচালি’তে অনেক লিখেছি। যাই হোক সস্ত্রীক বেরিয়ে পড়ি বাসে লাটাগুড়ির উদ্দেশে। গিন্নি জিজ্ঞেস করে, কী আছে লাটাগুড়িতে দেখার? উত্তর— জঙ্গল। গরুমারা জাতীয় উদ্যানের হৃৎপিণ্ড। মধ্যিখানে পরাণের আশ্রম। এককথায় সম্মতি এবং যথারীতি গোপ পরিবারে সাদর অভ্যর্থনা বুড়ি ও শিশু-কিশোরদের। জেঠু ও জেঠিমাকে কীভাবে দেখাশোনা করবে তা নিয়ে সকলেই কমবেশি চিন্তিত। আজও প্রায় বছর চল্লিশেক পরেও পরাণের সঙ্গে সেই গভীর মধুর সম্পর্ক আগের মতই আছে। কোনও তারতম্য, ফাটল ধরেনি। কর্তা-গিন্নি মিলে লাটাগুড়িকে কেন্দ্র করে কত জায়গাই না ছুটে বেড়িয়েছি। কালামাটি থেকে রামসাই, বুধুরাম, চটোয়া, চুকচুকি, সুরসুতিপুর, খাগড়িজান, খাপুয়ারকোন, ঘ্যাগারডাবরি কোথায় না গিয়েছি? সেইসব দিনগুলির কথা আজ স্মৃতি-বিস্মৃতির অন্তরালে। শুধু স্মৃতিরোমন্থন, জাবর কেটে যাওয়া।

ধীরে ধীরে লাটাগুড়ির ভোল পাল্টাতে থাকে। অতীতের শান্ত নীরবতা স্নিগ্ধতা, আরণ্যক সৌন্দর্য ক্রমশ যেন বিবর্ণ, ফ্যাকাসে হয়ে এসেছে। জঙ্গল প্রায় ভ্যানিস। কাঠের অনুপম হেরিটেজ ঘরবাড়ি কমে এসেছে। আধুনিক শহুরে ছাপ পুরো মাত্রায়। বলা যায় রিসর্টের জঙ্গলে পরিণত। ভালমন্দের হাতছানি। অভিমান অভিযোগ করলে অনেকেই বলেন— আপনি তো মশাই কলমের খোঁচায় বিখ্যাত করেছেন লাটাগুড়িকে, এখন কেন সমালোচনা করছেন? প্রয়াত বন্ধু, বনমন্ত্রী যোগেশ বর্মন মশাই দেখা হলে বলতেন— গৌরীবাবু লাটাগুড়ির প্রতি আপনার ভীষণ টান-ভালবাসা।

অভিমান অভিযোগ করলে অনেকেই বলেন— আপনি তো মশাই কলমের খোঁচায় বিখ্যাত করেছেন লাটাগুড়িকে, এখন কেন সমালোচনা করছেন? প্রয়াত বন্ধু, বনমন্ত্রী যোগেশ বর্মন মশাই দেখা হলে বলতেন— গৌরীবাবু লাটাগুড়ির প্রতি আপনার ভীষণ টান-ভালবাসা। লাটাগুড়ির প্রথম রিসর্ট গড়ে তুলেছিল শিলিগুড়ির হেল্প টুরিজম। তারপর হাত বদল হতে হতে পঞ্চবটীতে। হেল্প টুরিজম পর্যটনের প্রদীপ জ্বালিয়েছিল লাটাগুড়িতে। সেটা এক ইতিহাস।

তবু বলতেই হয় লাটাগুড়ি এখন ক্ষতবিক্ষত। অতি সম্প্রতি সস্ত্রীক লাটাগুড়ি যাই কেমন আছে দেখতে। বিচাভাঙা রেলের লেবেল ক্রসিং-এর কাছে পৌঁছে দেখি চারিদিক ন্যাড়া, ধূসর মরুভূমির মত। কোথায় হারিয়ে গেল শালবন? শত শত গাছগুলিকে হত্যা করে মহা কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। হায় উন্নয়ন। গিন্নি বলে ‘ওই যে সিলভার রিজ, পঞ্চবটী। দু’পাশের দোকানপসার সব ভ্যানিস’। চালক হরলিক্স এর মন খারাপ। কাকু একী ছন্নছাড়া বাঞ্ছারামের বাগান! লন্ডভন্ড পাকানো অবস্থা। কোথায় সেই বাইসন মোড়। এরই মাঝে পিডব্লুডি-র হেরিটেজ কাঠের বাংলোটি পুড়ে ছাই। হরলিক্স আমাদের ‘পথের সাথী’তে নামিয়ে দিয়ে ফিরে যায় মূর্তিতে। দু’রাত্রি ছিলাম। অবস্থান তথা থাকা খাওয়ার জন্য নিঃসন্দেহে সেরা বলতেই হবে। শ্রীমান টুইঙ্কলের আমাদের আগমনের বার্তা জানা ছিল। পরাণের নির্দেশে সব কিছু ব্যবস্থা ঠিকঠাক করে রাখে। গৌরীদা আপনি ও বৌদি ‘পথের সাথী’তে থাকবেন।

চায়ে একটু চুমুক দিয়ে গিন্নিকে বলি, চলো একটু হেঁটে আসি। গেটের কাছে যেতেই দেখি পল্টু দাঁড়ানো। ‘ও গৌরীদা, কবে এলেন লাটাগুড়ি?’ পল্টুর করাতকল চলছে পাশাপাশি তার ‘লেকভিউ রিসর্ট’। চারিপাশে কাঠের লাঠা (কাঠ)-র স্তূপ। ‘বুঝলেন দাদা সেই লাটাগুড়ি নেই’। ‘কী করবে, পরিবর্তন জগতের নিয়ম।’ পল্টুর থেকে বিদায় নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কিছুটা যেতেই বাঁ দিকে দেখি প্রকাশবাবাজি দাঁড়ানো। ডান দিকে মহুয়া রান্নাঘরে ব্যস্ত। ঠুঁটো জগন্নাথ প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্র, ভূতুড়ে বাড়ি। গাছের আড়ালে বসে আছে মানব। ‘কেমন আছেন গৌরীদা?’ পঞ্চবটী-র নিশানা সাইনবোর্ড নেই। দেখা হল অনন্ত, রবীন, মায়াদির সঙ্গে। লাটাগুড়ির প্রথম রিসর্ট গড়ে তুলেছিল শিলিগুড়ির হেল্প টুরিজম। তারপর হাত বদল হতে হতে পঞ্চবটীতে। হেল্প টুরিজম পর্যটনের প্রদীপ জ্বালিয়েছিল লাটাগুড়িতে। সেটা এক ইতিহাস।

অনন্ত বলে “স্যার দুপুরবেলা আমাদের এখানে খাওয়াদাওয়া করে যান। এখন তো আপনার এখানে আসা যাওয়া কমে গেছে। আমাদের ভুলেই গেছেন।” বললাম ‘কাউকে ভুলিনি সবার কথাই মনে আছে। আমি সেলিব্রিটির আলখাল্লা পরে ঘুরি না, আমি তোমাদের মতই সাধারণ মাপের মানুষ। লাটাগুড়ির প্রতি আমার একটা ভীষণ দুর্বলতা। এটা ঠিক বলে বোঝাতে পারব না।’

দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে বাতানুকুল ঘরে গড়াগড়ি দিয়ে বিকেলবেলায় টোটো ধরে পরাণের বাড়ির দিকে রওনা হই। যাওয়ার পথে দেখা হয়ে যায় পুকাইদের সঙ্গে। ‘এখন ডুয়ার্স’এর ছোট্ট অথচ সুন্দর গোছানো দোকান। আড্ডাঘরও বলা যায়। এখানেই দেখা হল চঞ্চল, প্রণব, গদাই আরও অনেকের সঙ্গে। পুকাই বলল, জেঠু কী খাবেন? এগ ডেভিল না মোচার চপ? গিন্নি পুকাইকে ধমক দেয়— জেঠুর বয়স কমছে না বাড়ছে? তোমরা ছেলেমানুষ খাও। শেষ পর্যন্ত এগ ডেভিল সঙ্গে চা। বাকিরা স্বাস্থ্য বিষয়ে আমার চেয়ে একশগুণ সচেতন। অনেকে প্রশ্ন করে আপনার লেখাতে খাওয়ার কথা খুব থাকে? মানে খেতে খুব ভালবাসেন তাই না? বললাম— ভ্রমণ ও ভোজন বঙ্গ জীবনের অঙ্গ।

পুরনো লাটাগুড়ির গল্পের শুরু আছে শেষ নেই। সন্ধ্যার পর এখন ডুয়ার্স থেকে হেঁটে পরাণের বাড়িতে

মূর্তি নদী

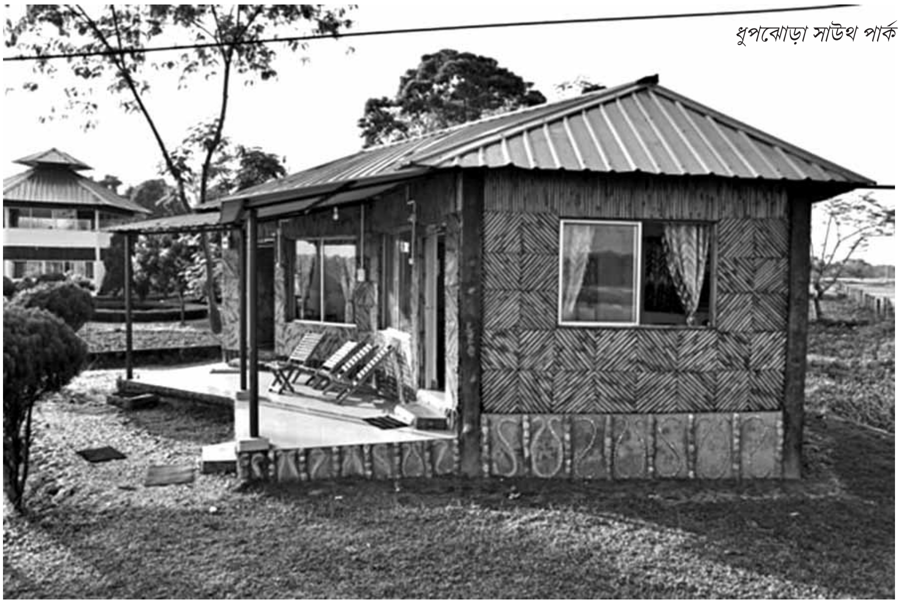

ধুপঝোড়া সাউথ পার্ক

যাই। বিছানার ওপর পরাণ জয়গুরু হয়ে বসে আছে। একটু ঝিমুচ্ছে। বুড়ি এল সঙ্গে শম্ভুচরণ। আবার সেই মিষ্টি, সিঙাড়া। কিন্তু গিন্নির সতর্কবাণী— খেয়ো না কিন্তু। খাবো না করতে করতে একটা মিষ্টি খেতেই হয়। পরাণ বলে বৌদি গৌরীদা এখনও ফিট। তারপর সে কী অট্টহাসি। কত পুরনো স্মৃতি জড়ান পুরনো দিনের সেই সব আড্ডা। রতনদা, মানু, বিমল, রহমান, বরুণ, প্রকাশ, বাবলি সকলের কথাই মনে পড়ে।

পরাণ বলে, গৌরীদা এখন আর বেশি চিন্তা ভাবনার লোড নিতে পারি না। যাবেন নাকি নাগরাকাটায় সুমনাদের বাড়িতে?

এবারে আর হচ্ছে না পরাণ।

আহা গৌরীদা সেই দিনগুলি যদি ফিরে পেতাম? সেইসব সোনালি দিন। একে একে সবাই তো চলে যাচ্ছেন গৌরীদা। সুধীরদা নেই, বাবলিও নেই, মানু অনেক আগেই চলে গেছে। বড় শূন্যতা— বড় বেদনার।

বললাম বাদ দাও, মৃত্যু নিয়ে এত ভেব না যখন যাবার সময় হবে কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। অনন্তকাল কী ভুষুণ্ডীকাক হয়ে বেঁচে থাকতে পারবে?

ঠিক বলেছেন দাদা।

পরদিন সকালবেলায় স্টেশনপাড়ায় চঞ্চলদের বাড়িতে যাই। যাবার পথে রতনের সঙ্গে দেখা হয় তার দোকানে। চমৎকার হস্তশিল্পের দোকান। লাটাগুড়ির রত্ন রতন। ওর আঁকা ছবি, কাটুমকুটুম কাঠ খোদাই করে তৈরি শিল্পকলা দেখে মন জুড়িয়ে যায়। দুঃখ এটাই প্রচারের আলোতে আসতে পারল না। মনে পড়ে বছর তিরিশেক আগে কী তারও বেশি চঞ্চলদের বাড়িতে সস্ত্রীক এসেছিলাম। সেই দোতালাটা আর নেই। লাটাগুড়ির সেই স্টেশন ছিল ভুতুড়ে বাড়ি। চঞ্চল যে কী খুশি আমাদের দুজনকে পেয়ে। ওর শিশুর মত সারল্য আমাকে মুগ্ধ করে। ব্যাগ ভর্তি করে গুছিয়ে দেয় ডাটা শাক, বিশল্যকরণী, নারকেল, পাকা বেল আরও নানা জিনিস। এই দেবার আনন্দ আজকাল কমে এসেছে। মানুষ ভীষণ আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর। শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবে। চঞ্চলদের বাড়িতে বসে দুজনে বেলের সরবত খেলাম। প্রাণ খুলে গল্প করলাম। তিন পুত্রের পিতা এখন সুখের সংসার। লাটাগুড়ি থেকে বড় দিঘি, মূর্তি, বাতাবাড়ি, ক্রান্তি, কাঠামবাড়ি, ধুপঝোড়া কতবার যে দুজনায় গেছি তার কোনও হিসেব নেই।

সেই সময় কাকুরবাড়ির জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। মূলত আশিসবাবু, মানু আরও অনেকের চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল। প্রচণ্ড পরিশ্রম করত মানু। পরবর্তীকালে চারমূর্তির প্রচেষ্টায় তৈরি হল 'ধুপঝোড়া সাউথ পার্ক'— তাপস, পার্থ, গৌতম, সুদীপ্ত। খড়ের ছাউনি, বাঁশের বেড়া দেওয়া ছোট ছোট কুটির। সত্যি নান্দনিক। রঞ্জুর শিল্পকর্ম। বিভিন্ন ঋতুতে সাউথ পার্কে গিয়ে থাকতাম। ঘোর বর্ষায়, শীতে, বসন্তে সে যে কী আনন্দ বোঝাতে পারব না। আসর জমে উঠত ভোলেভালা তাপসের বন্ধু বাবলার আগমনে। ব্রহ্মডাক্তারের সান্নিধ্যে। সন্ধ্যায় প্রদীপ ওঁরাওদের নাচ-গান, মাদলের ধিতাং ধিতাং বোল। বাঁশের মাচায় বসে জ্যোৎস্না প্লাবিত মূর্তি নদীর দৃশ্য দেখা মনে পড়ে। ময়ূরের ডাক। কখনও বাঁশিওয়ালার বাঁশি শুনে ঘুমিয়ে পড়া। কতকাল যাওয়া হয় না 'ধুপঝোড়া সাউথ পার্ক'। মাঝে তাপস একবার এসেছিল শিলিগুড়ির বাড়িতে। স্যার কবে যাবেন আপনি আর বৌদি আমাদের ওখানে? আমি আপনাদের সঙ্গে নিয়ে যাব। এখন গেলে চিনতে পারবেন না। খোলনোলচে পাল্টে দিয়েছি। মনে পড়ে তাপসদের রিসর্ট থেকে দেবেন গাড়িতে চেপে জ্যোৎস্না রাতে 'কাইঞ্জল নজরমিনারে' বসে ভুত দেখা। জ্যোৎস্নায় মূর্তির চরে গন্ডার। আর দিনের বেলায় মূর্তি নদীতে হাতিদের স্নান। এ সবই তো জীবনে পরম পাওয়া। আমার দুজনেই তা পরম আনন্দে উপভোগ করেছি। কখনও পরিমলের আশ্রমে ডুয়ার্স নেস্টে গিয়ে থাকি। পক্ক কেশ, শুভ্র বেশ, দাড়ি। দেখলে মনে হবে মোদীজির ছোট ভাই। ক'দিন আগে লোকনাথবাবার তিরোধান উৎসবে যাই। সেখান থেকে বৃষ্টির মধ্যে চলে যাই ঝালং, প্যারেন হয়ে ওয়াইল্ড উডস্ রিট্রিট। অ্যাড্রোনিকাস রাইয়ের আতিথ্য অসাধারণ। সত্যি সে এক রূপকথার দেশ। ফেরার পথে কিছুক্ষণ দাঁড়াই বর্ষণস্নাত টিয়াবনে। মনে পড়ে গরুমারা জঙ্গল লজের কথা।

দিন সাতেকের সফর শেষে শিলিগুড়িতে ফিরে আসার পর লাটাগুড়ির অরণ্য থেকে অনিন্দিতার টেলিফোন, 'তুমি লাটাগুড়িতে কোথায়? আসবে না আমাদের এখানে?'

না গো এ যাত্রায় আর হল না। আমি এখন হট্টমেলার দেশে।

'মানে'?

শিলিগুড়িতে। *(চলবে)*

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {21cm (W) X 28 cm (H)}, Non Bleed {18cm (W) X 25 cm (H)}, Half Page Horizontal {18 cm (W) X 12 cm (H)}, Vertical {8.5 cm (W) X 25 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5.6 cm (W) X 25 cm (H)}, Horizontal 18 cm (W) X 6.5 cm (H), 1/4 Page 8.5 cm (W) X 12 cm (H), 1/6 Page {5.75 cm (W) X 12.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2018 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

আমায় বৌদ্ধ করে দে

চোর ঠ্যাঙানর ভিডিও দেখলুম সার! চোর যদি হবে তবে 'জয় শ্রীরাম' বলতে বলল কেন? 'জয় হনুমান' বলতে বলল কেন? চোরটা তো বলল। তারপরেও সার মরে গেছে।

তবে গপ্পোটা কী দাঁড়াল সার? রামের নাম নিলেও মরে। হনুমানের নাম নিলেও। তা সার, মরবই যদি তবে ফালতু রাম-হনুমানের নামে ধ্বনি দিয়ে অক্সিজেন খর্চা করে মরব কেন? এমনিতেই তো হিন্দু ধর্ম এক্সেপেন্সিভ। বছরে একটা শনি পুজো— খচ্চা পাঁচ হাজার। বড় করে একটা কালী পুজো— পনের হাজার। বাপের বাৎসরিক— কম করেও সাত-আট। কোথায় পাব সার? হিন্দুভাতা বলে তো কিছু দেয় না। মোদি গম্মেন্ট যদি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পুজোর জন্য কিছু পাঠিয়ে দেয়, তবে উপকার হত।

এবার বাজেটে শুনছি ধম্মের জন্য কিছু থাকবে? সত্যি?

বউকে নিয়ে দু-চারবার বিখ্যাত মন্দিরে পুণ্য করতে গিয়েছিলুম সার। কম পয়সার লাইনে দাঁড়িয়েছিলুম। অনেকক্ষণ দাঁড়ানর পর পুণ্য হল। ট্রাভেলিং কাম পুণ্য সার। তবে সার— আমি টোটো চালাই। বিএ পাস। সংসার টেনে ক-টা মন্দিরেই বা যেতে পারব? মোদি গম্মেন্ট একটা ধম্মমেলা করতে পারে না? মেলায় সব মন্দিরের স্টল থাকবে। শস্তায় সব তীর্থ দর্শন হয়ে যাবে সার। চারটে মন্দিরে পুজো দিলে সার একটা মন্দির ফ্রি।

আমার এক ইকোনমিস্ট ফ্রেন্ড আছে— হেব্বি ট্যালেন্ট সার! সে একটা থিওরি বলেছিল। শুনছি দেশে বেকারত্বের হার সাড়ে চল্লিশ বছরে হায়েস্ট— তাহলে ধর্মবন্ড চালু করতে পারে।

ধর্মবন্ড বুঝলেন না? আমার ফ্রেন্ডের থিওরি। গম্মেন্ট ধম্মের নামে বন্ড ছেড়ে দিক। হিন্দু পাব্লিক বন্ড কিনে পুণ্য পাবে। বড় বড় মন্দিরে সার্টিফায়েড পুণ্য সার। ধরুন আপনি পঁচিশ হাজার টাকার বন্ড কিনলেন। আপনাকে গোমুত্র মেশান কালিতে ছাপা সার্টিফিকেট আর প্রসাদী পুষ্প দেওয়া হল। আপনি সার সার্টিফায়েড হিন্দু হয়ে গেলেন। তখন ট্রেন ভাড়ায় ছাড়, ব্যাঙ্কের সুদে ছাড়—।

ধম্মের তখন সেক্স থুড়ি সেনসেক্স হবে সার। একদিন সকালে দেখলেন সত্যনারায়ণ মন্দিরের শেয়ারে ধ্বস নেমেছে। সেই মন্দিরের দেবতার বাজার দর ফল করেছে। আপনি সার সে মন্দিরের শেয়ার বেচে জল্পেশের শেয়ার কিনলেন। একদম সার সেই গল্পটার মত।

তা হলেও সার আমার খুব একটা লাভ হবে না। টোটো চালিয়ে আর ক-টাকার বন্ড কিনতে পারব সার? চারদিকে এত হিন্দু হিন্দু রব! এত এত গেরুয়া! প্রধানমন্ত্রী গুহায় বসে ধ্যান করছেন, হৈ হৈ করে পুজো দিচ্ছেন— এতে কি ধম্ম করার খর্চা কমছে? এই যে বছর বছর পুজোআচ্চা করে খর্চা করছি— চালাচ্ছি তো সেই টোটো। পয়সাগুলো রেখে দিলে সার একটা সেকেন্ড হ্যান্ড মারুতি ভ্যান নেমে যেত!

রামমন্দির হলে কি সার প্রচুর চাকরি হবে? শুনছি নাকি বিরাট মন্দির হবে? অনেক পোস্টে লোক লাগবে? এসসি এসটিদের নেবে না বোধহয়! হিন্দু ধম্মে তো জেনারেল কাস্টই শেষ কথা। তাই যদি হয় তবে আমার লাভ হবে না সার।

সেদিন সার একটা প্যাসেঞ্জার উঠেছিল। বড় টাইপের হিন্দু সার। আমায় বলল, শুধু পুজো করলে হবে না। পুজোর সঙ্গে ইয়োগা প্র্যাকটিশ করতে হবে। সক্কাল সক্কাল উঠে এক ঘণ্টা ইয়োগা করে অ্যালোভেরা জুস খেয়ে আধঘণ্টা ধ্যান। ব্যাপারটা ভাল, তবে আমাকে তো সক্কাল উঠে টোটো মোছামুছি করতে হয়, কাপড়-জামা কাচতে হয়, মেয়েকে স্কুলে নামাতে হয়— অ্যালোভেরা জুস খাব কখন? ইয়াগো করলে পুণ্যটা সার একটু বেশি হত, মানছি। প্যাসেঞ্জারটা খুব এডুকেটেড হিন্দু ছিল সার! ভুল বলবে না।

মুসলিম হলে সার এত খর্চা হত না। খোঁজ নিয়ে দেখেছি নামাজ সার একদম ফ্রি-তে পড়া যায়। শুক্কুরবার মসজিদ। সেখানেও পয়সা লাগে না।প্রসাদের জন্য সন্দেশ কিনতে হয় না। লক্ষ্মীপুজোর দিন পুরুৎ মশাইয়ের জন্য ওয়েটিং নেই। জামাই ষষ্ঠীতে হাজার টাকার মাছ কেনা নেই। তবু সার কত পুণ্য। এত্ত পুণ্য যে বিশ কোটি মুসলিমের দাপটে একশো কোটি হিন্দু যায় যায়।

কিন্তু মুসলিম হলে সার মুসলিম তোষণ হয়ে যাবে। এইটা সার কী করে করব? মুসলিম এমন একটা ব্যাপার যে একটু তোষণ করেছেন কী দেশদ্রোহী হয়ে যাবেন। হিন্দু নিজেকে ছাড়া আর যদি কাউকে তোষণ করার রাইট পায় তবে সে খ্রিস্টান। খ্রিস্টান তোষণ সার খুব ভাল সার। স্টেটাস বাড়ে। বড়দিনে গবাগব কেক মারবেন। থার্টি ফাস্টে রাত বারোটায় হুয়া হুয়া করে বাইকের হর্ন বাজিয়ে পটকা ফাটাবেন। কোথাও কোন সমস্যা নেই।

কিন্তু সেখানেও খর্চা সার। আপগ্রেড হিন্দু হিসেবে একটু খ্রিস্টান তোষণ করে পুণ্য বাড়াব— ভাল একটা কেক না খেলে চলে? এদিকে মা আবার বাপের ডেথ হওয়ার নিরামিষ। নন ভেজ কেকের সার দাম বেশি। তারপর ধরুন থার্টি ফাস্টে হর্ন বাজার— একটা বাইক মিনিমাম থাকা দরকার। টোটোর হর্নে কি সার যিশু খুশি হবেন?

তাই ভাবছি সার বৌদ্ধ ধম্মটাই আমার পক্ষে ভাল। পাহাড়ে যাই সার— বৌদ্ধদের দেখি। খর্চা প্রায় নেই বললেই চলে। বুদ্ধ ঠাকুরকে সার মেরি বিস্কুট দেওয়া যায়। সরস্বতী পুজো না করেও ওদের লেখাপড়া হয় সার! বিলিভ মী!

সুতরাং বৌদ্ধই ভাল সার। মুসলিম তোষণ হচ্ছে না। নন ভেজ কেক কিনতে হচ্ছে না। আমাদের ধম্মের পুরুৎরা সার হাসে না। খালি অভিশাপ দেওয়ার মত মুখ করে থাকে। বৌদ্ধ বামুনরা মিটি মিটি হাসে সার। দেখেই ভাল লাগে।

আমাকে বৌদ্ধ করে দিন সার। এক্সেপেন্সিভ হিন্দু ধম্ম খুব চাপ হয়ে যাচ্ছে। দেখি বাজেটে কী হয়।

লাফিং বুদ্ধ একটা কিনে ফেলেছি।

অনু ঘটক

ডুয়ার্সের বই। রংরুট-এর বই

আমাদের বইপত্র এখন নিজের ঠিকানাতেই পেতে পারেন

বিষয় ডুয়ার্স

ডুয়ার্স বেস্ট সেলার
তিস্তা - উৎস থেকে মোহনা। অভিজিৎ দাশ। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি। দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা ***
চায়ের ডুয়ার্স কী চায়? গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা
ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে? সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা ***
আলিপুরদুয়ার। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
কোচবিহার ২য় সংস্করণ। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
জলপাইগুড়ি। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ৩০০ টাকা

ডুয়ার্সের গল্প সংকলন
ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা
চারপাশের গল্প। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা ***
লাল ডায়েরি। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
সব গল্পই প্রেমের নয়। হিমি মিত্র রায়। ১৬০ টাকা

ডুয়ার্সের পেপারব্যাক সিরিজ
ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস। সংকলন। ১৯৫ টাকা
তরাই উৎরাই। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৬৫ টাকা
লাল চন্দন নীল ছবি। অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা
শালবনে রক্তের দাগ। ১২৫ টাকা
অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন। বিপুল দাস। ৫৫ টাকা
মেঘের পর রোদ। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা
কুহুলিয়াদের দেশে। সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা
পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের হাজার কবিতা। অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা
বোধিবৃক্ষ ছুঁয়ে এক চির ভিক্ষুক। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা

বিষয় পর্যটন

আমাদের পাখি।
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা
সিকিম। সংকলন। ২০০ টাকা ***
নর্থ ইস্ট নট আউট।
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা
রংরুটে হিমালয় দর্শন।
সংকলন। ২০০ টাকা ***
উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা ***
সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে। সংকলন
১৫০ টাকা ***
মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।
সুভদ্রা উর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা ***
সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা ***

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন। তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা
জয় জল্পেশ। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৯০ টাকা

অরণ্য কথা বলে।
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা ***
সে আমাদের বাংলাদেশ।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা
পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
তিন মহাদেশ দশ দিগন্ত।
শান্তনু মাইতি। ১৭৫ টাকা

বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।

হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৬২৯৭৭৩১১৮৮ নম্বরে

ন্যুনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।

আমাদের বই যে সব দোকানে পাওয়া যায় (বই না পেলে অর্ডার করুন)

কলকাতা: দে'জ ও দে বুক স্টোর, কলেজ স্ট্রিট। **রিড বেঙ্গলি বুক স্টোর** ৪২ এ সর্দার শংকর রোড, কলকাতা ২৯। ফোন ৮১০০৯০৫৫৬৬

শিলিগুড়ি: বিশ্বাস বুক এজেন্সি, হিলকার্ট রোড বাটা গলি। **জলপাইগুড়ি: ভবতোষ ভৌমিক** কমার্স কলেজের বিপরীতে **আলিপুরদুয়ার: ম্যাগাজিন সেন্টার** কলেজ হল্ট। **কোচবিহার: দাস নিউজ এজেন্সি** বড় পোস্টাপিসের বিপরীতে। **ফালাকাটা:** পাঞ্চজন্য। **মালবাজার: বইঘর,** আদর্শ বিদ্যাপীঠের উল্টোদিকে। **বিন্নাগুড়ি:** সিটি বুক স্টল। **বানারহাট:** গ্রন্থ ভারতী। **বীরপাড়া:** পোকিসা। **মালদা:** পুনশ্চ। **রায়গঞ্জ:** ধানসিঁড়ি।

*** প্রায় নিঃশেষিত

অনলাইনে কিনুন আমাদের বইপত্র **www. readbengalibooks.com**

EKHON DUARS, Vol-6, Issue-4 WBBEN/2014/56733 Rs. 20 only

বাশবটে এক্কাবাড়ি

সিন্টু ভট্টাচার্য

রোহিণী হয়ে ঘুম পৌঁছে একটু মোমো ব্রেক-এর পর আবার বেরিয়ে পড়া। আমাদের যেতে হবে মানেভঞ্জন ও ধোত্রে হয়ে বাশব টে বাজার ছাড়িয়ে আর দু কিলোমিটার আপার লিংসেবং। এনজেপি থেকে গাড়িতে সময় লাগে ৫ থেকে ৬ ঘন্টা। উচ্চতায় প্রায় ৭০০০ ফুটের কিছু বেশি। চারিদিকে আকাশচুম্বী পাহাড়ের সারি, নিচে বয়ে চলা নদী লোদোমা আর সিঙ্গালিলা ঘেরা একটি ছোট্ট গ্রাম তামাং গাঁও। বাশবটের অন্তর্গত আপার লিংসেবং-এর যেন এক ভালবাসার সৌধ। এরই মাঝে একরাশ শুভ্র মেঘের সংসারের আজ আমাদের আমন্ত্রণ, বাড়ির নাম এক্কাবাড়ি। পাশ দিয়ে চলে যাওয়া মেঘে ভেজা কালো পীচের রাস্তা হঠাৎ যেন মিলিয়ে গেছে জঙ্গলের মাঝে। জনা দশেক নেপালি পরিবার নিয়ে ছোট্ট গ্রামখানির উপর আমাদের কুটির এক্কাবাড়ি। চারটে দুই শয্যার ঘর, একটি বসার ঘর ও একটি কিচেন কাম ডাইনিং নিয়ে পরিপূর্ণ একটি হোমস্টে। প্রকৃতির নিজের খেয়ালে অগোছালো আঁকা এক ক্যানভাস। টুরিস্ট কবলিত না হবার দরুণ এখানে মানুষ এখনও বদলে যায় নি, আমরা যেন তাদের পরিবারেরই একজন, মেকি ব্যাপারটা কখন জানি নিজের থেকেও হুশ করে উধাও হয়ে গেছে। সন্ধ্যা বাড়ার সাথে সাথে জোনাকিরা ঢেকে ফেলেছে দূরের পাহাড়গুলোকে। ততক্ষণে হিমেল পরশে দেহমন জুড়িয়ে গেছে, জড়িয়ে নিয়েছে উষ্ণতাকে।

ভোরের আলো ফোটার প্রায় সাথে সাথেই ক্যামেরাটা ঝুলিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। বাড়ির পাশের সরু রাস্তা ধরে নিচের দিকে যত নামতে লাগলাম প্রকৃতি তত নিজেকে খুলতে শুরু করল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট বাড়িগুলোকে অতিক্রম করে কিছু দূরে একটা বাঁক নিয়ে রাস্তাটা আরও নিচের দিকে লোদোমা চলে গেছে, আর একটা সরু রাস্তা ঢুকে গেছে জঙ্গলে। কালচে সবুজ শ্যাওলার আচ্ছাদন বড় বড় গাছগুলির নিচ থেকে উপর পর্যন্ত প্রায় ঢেকে ফেলেছে, সূর্যের আলো মাঝে মাঝে গাছের ফাঁক ফোঁকর দিয়ে এসে এক অদ্ভুত আলোছায়ার সৃষ্টি করেছে। জঙ্গলের গভীরতা ভালই, খানিক আগে এক গ্রামবাসীর মুখে শুনেছিলাম আগে এখানে ভাল্লুকের আনাগোনা ছিল, তখন এখানে কেউ বাস করত না, শুধু চাষবাসের জন্য এখানে আসত। এখন গ্রাম বাড়ার সাথে সাথে তারাও চলে গেছে। তবুও এই নির্জন জঙ্গলে একটু ভয় ভয় করছিল।

এখান থেকে রিম্বিক মাত্র ১৫ মিনিটের পথ আর শ্রীখোলা ৪৫ মিনিট। ব্রেকফাস্ট এর পর বেরিয়ে পড়লাম। আকাশ বেশ পরিষ্কার থাকায় কাঞ্চনজঙ্ঘা তার রূপ থেকে আমাদের বঞ্চিত করেনি, রাস্তার বেশ কিছুটা সময় আমাদের সাথে সাথেই ছিল। আমার প্রিয় শ্রীখোলা, প্রায় ১০ বছর আগে সান্দাকফু হয়ে ফেরার সময় এক রাত কাটিয়েছিলাম সেখানে। আজ সে কেমন আছে তা দেখবার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। না সে আজও বদলায়নি, টুরিস্টদের কোলাহল এখনও নেই, আজও তার চলার কুলকুল শব্দ প্রাণে ভালোবাসার সুর এঁকে দিয়ে যায়। জুতো খুলে তার হিমশীতল জলে পা চুবিয়ে সেই ফেলে আসা স্মৃতি রোমন্থনে মগ্ন হলাম। পথে দেখা হল দুটো গ্রুপ-এর সাথে যারা ট্রেক করে ফিরছে সান্দাকফু থেকে। প্রচুর গল্প ও ছবি তোলার পালা শেষ করে ফেরার পথ ধরলাম। আমাদের ড্রাইভার জানাল এক্কাবাড়ির কাছেই নাকি একটা ট্রেক রুট আছে সান্দাকফু যাবার। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সোজা কালপোখরি হয়ে সান্দাকফু পৌছনো যায়, আর কপালে থাকলে চতুষ্পদদের দেখাও মিলতে পারে এই পথে। লোভী মনটা কেমন যেন অশান্ত হয়ে ওঠে, এক্ষুনি বেড়িয়ে গেলেই তো হয়!

লোভ সংবরণ করে সে যাত্রায় ফিরে এলেও জানি সেই অজানা পথে সান্দাকফু পৌছনোর আকাঙ্খা আমাদের আবার টেনে আনবে এই এক্কাবাড়িতে।

যোগাযোগ ৯৮৩৬৮ ৩০৩৪২

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.